ইবাদত ও খিদমত

মাওলানা মুজীবুল্লাহ্ নদভী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

ইবাদত ও খেদমত

॥ পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ

ইবাদত ও খেদমত

মূল

মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদভী

শিক্ষক : জামিয়াতুর রাশাদ

আজমগড়, ইউপি, ভারত।

অনুবাদ

মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

শিক্ষক : জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫

ইবাদত ও খেদমত

মূল
মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদভী

অনুবাদ
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

প্রকাশক
মাওলানা মাহমুদুল হাসান (বড় হুজুর)
মহাপরিচালক : নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড
প্রতিষ্ঠাতা : নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
মোবা : ০১৯৭৫-০০৯৮২৪

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০০১

পরিমার্জিত সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

অঙ্গসজ্জা
জাগরণ বর্ণসাজ, ০১৪০৮-৮৩৭৮০০

মূল্য
১৪০.০০ (একশ চল্লিশ) টাকা মাত্র

তোহফা

যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, মহান ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আলহাজ হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব রহ. (প্রতিষ্ঠাতা : নাদিয়াতুল কুরআন শিক্ষাবোর্ড) এবং পরম শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান, যাঁর স্নেহসুধা ও নির্দেশনা ছিল আমাদের জীবন গঠনের পাথেয়, আল্লাহ তায়ালা এই সামান্য প্রয়াসকে তাদের মাগফিরাতের উসীলা বানান।

–প্রকাশক

রবিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরি

প্রকাশকের কথা

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী বাংলাদেশের একটি স্বতন্ত্র দ্বীনী, তাবলীগী প্রকাশনা সংস্থার নাম। বহু দিন যাবৎ আমাদের এ প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রকাশ করে আসছে।

বর্তমান সমাজের চাহিদা মেটাতে আমরা এ খেদমতের মাত্রা আরও বেগবান করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সে চাহিদা পূরণে আমরা 'নাদিয়াতুল কুরআন ফাউন্ডেশন' নামে আরেকটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান খুলে আমাদের এই খেদমত বাংলার প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রকাশিত বইটি তারই একটি অংশবিশেষ। আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের এ খেদমতকে কবুল করে নিন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের উসীলা বানান। আমীন।

মাহমুদুল হাসান
চকবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

ইসলাম মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও এতে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ইবাদতের পাশাপাশি খেদমতের কথাও এ বিধানে গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মানবসেবা ও খেদমতের প্রেরণা পরিপূর্ণ রূপেই বিদ্যমান ছিলো। তাদের খেদমতে আকৃষ্ট হয়েই হাজার হাজার বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলো; কিন্তু ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্য থেকে সেবার সেই মনোভাব দূর হয়ে গেছে। মুসলমান আজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে জাতিকে ভুলে গেছে। পরিণামে সেবার সেই ডালি নিয়ে মাঠে নেমেছে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা আজ ঈমান-আমল হরণ করছে অবলীলাক্রমে। তাই আজ আবার আমাদেরকে সে আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। আমি আশা করি, সে আদর্শের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এ বই কিছুটা হলেও ভূমিকা পালন করতে পারে। লেখক অত্যন্ত যুক্তি সহকারে এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে খেদমতের উপর সবিস্তারে এ বইয়ে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

মীযানুর রহমান কাসেমী
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

লেখকের কথা

'ইবাদত ও খেদমত' নামের এ ছোট্ট পুস্তিকা, যা এখন পাঠকদের হাতে; এতে আমি আমার দীর্ঘদিনের আবেগ ও অনুভূতিকে আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি, যেন কুরআন-হাদীসের আলোকে খেদমতকে ইবাদতের আঙ্গিকে সাধারণ মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে পারি। এতে আমি কোনো সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির আশ্রয় নিইনি। কুরআন-হাদীসকে যথাযথ ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, আজ মুসলমানদের বিভিন্ন দল, সংগঠন, সংস্থা এবং অসংখ্য ব্যক্তি বিভিন্ন উপায়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। তারা সকলেই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য; কিন্তু এটাও বাস্তব কথা, আমাদের খেদমতের ময়দান ও পরিসীমা অত্যন্ত সীমিত। আমরা এক বিশ্বজনীন ধর্মের অনুসারী। সুতরাং আমাদের খেদমতের ময়দান ও কর্মপন্থা বিশ্বজনীন হতে হবে। সারা দুনিয়ার কথা নাহয় বাদই দিলাম, আমাদের এ ভারতবর্ষে ৮০-৯০ কোটি মানুষের বসবাস। এখানে আমাদের সমস্ত সংস্থা বা সংগঠনের খেদমতকে একত্রিত করলে এর এক-শতাংশ পরিমাণও হবে না। এ ছাড়া আমাদের খেদমতের গণ্ডি শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অমুসলিমদের এই বৃহৎ জনসংখ্যা আমাদের খেদমতের বাতাসও পায় না। আজ আমাদের জন্য একান্ত প্রয়োজন—আমাদের তাবলীগ, খেদমত ও দাওয়াতের সীমা-পরিসীমা অমুসলিমদের মধ্যেও প্রসারিত করা। যদি আমরা এমনটি না করি, তাহলে আমাদের দায়িত্ব আমরা যথাযথভাবে পালনকারী বলে গণ্য হবো না। বড় দুঃখের বিষয়, এদেশের অমুসলিমদের সাথে হাজার বছর সহাবস্থানের পরও আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প রয়ে গেছে। আমরা দীর্ঘদিন একই গ্রামে, একই মহল্লায় বা পাশাপাশি বাড়িতে অবস্থান করছি; কিন্তু তারা আমাদের সহানুভূতির স্পিরিট এবং আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞ।

তাই আজ আমাদের প্রয়োজন, প্রথমে এ অপরিচিতির রেশ দূর করা। ঘৃণা-বিদ্বেষের এ দেয়ালকে ধসিয়ে দেওয়া। যার ফলে তারা আমাদের দ্বীন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে। এর জন্য আমাদের দৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ সেবা-সহানুভূতি এবং মানবিক মহব্বতই একমাত্র পথ হিসেবে কাজ করতে পারে।

এই মহব্বত ও আবেগের জজবা পয়দা করার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ পাক আমার এ মেহনতকে কবুল করুন। আমীন।

মাওলানা মুজীবুল্লাহ নদবী
শিক্ষক : জামিয়াতুর রাশাদ
আজমগড়, ইউপি, ভারত।

সূচিপত্র

ইবাদত ও খেদমত ॥ ১৩
ইবাদতের ব্যাখ্যা এবং তার ব্যাপকতা ॥ ২৮
মাখলুকের সেবা করাও ইবাদত ॥ ৩০
খেদমতের উপকারিতা ॥ ৫৩
কিছু খেদমতের কাজ ॥ ৫৫
চারটি কাজ ॥ ৬০
হায়! যদি আমরাও এমন নমুনা পেশ করতাম ॥ ৬০

সমাজ সংশোধনের উপায় কী? ॥ ৬৩
কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? ॥ ৬৭
এ রোগের ঔষধ কী? ॥ ৬৮
সমাজ কাকে বলে? ॥ ৬৯
নবীজীর নামায ॥ ৭১
রোযা ॥ ৭২
যাকাত ॥ ৭২
আয়াতের ব্যাখ্যা ॥ ৭৭
তুমি নিজেকে ভুলে যেয়ো না ॥ ৭৭
বক্তাদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী ॥ ৭৮
চেরাগ থেকে চেরাগ জ্বলে ॥ ৭৯

ইবাদত ও খেদমত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পরিপূর্ণ ইসলামী অনুশাসন বহু দিন আগেই উঠে গেছে। তাই আমাদের সমাজে যখন শরীয়তের কথা উচ্চারিত হয়, তখন আমাদের ভাবনা শুধু আকীদা ও ইবাদত-সম্পর্কিত মাসআলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, অথবা বিয়ে-তালাক, জন্ম-মৃত্যুর মতো কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে আমরা ইসলামকে স্মরণ করি। কিন্তু সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে শরয়ী হুকুমের পাবন্দী করার চিন্তা-ভাবনা আমরা করি না এবং বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগও করি না। বিশেষত আল্লাহর বান্দাদের হক আদায় করা, নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টিজগতের সেবায় নিয়োজিত থাকা, প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেওয়া, অসুস্থের সেবা-সুশ্রূষা করা, বিধবা, এতিম, দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ইসলামী আদব-আখলাকের অনুসরণ-অনুকরণ, হালাল রিজিক অন্বেষণ এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বীনের পথে চলে যে সওয়াবের অংশীদার হওয়া যায়, এসব ব্যাপারে অলসতা করলে যে গুনাহগার হতে হয়—সেদিকে আমাদের চিন্তা ধাবিত হয় না। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতকে আমরা যেভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এবং সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় মনে করি, বান্দার হক আদায় করা এবং তাদের সেবা করাকে আমরা সেরকম গুরুত্ব মনে করি না। আর কেউ যদি এগুলোকে দ্বীনের অংশ মনে করেও, তবু অতটুকু গুরুত্ব দিয়ে করে না, যতটুকু গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিলো।

ফলে শুধু জনসাধারণই নয়; বরং আমাদের উলামায়ে কেরামের মধ্যেও এমন ভাব পরিলক্ষিত হয় যে, তারা শুধু বাহ্যিক পবিত্রতা, ফরজ ইবাদত আর সামান্য কিছু সামাজিক মাসআলা-মাসাইল যথা : বিয়ে,

তালাক ও জন্ম-মৃত্যুর হুকুম আহকামের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হন। দ্বীনী মাদরাসাগুলোতেও এসব হুকুম-আহকামের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে। অন্যান্য হুকুম-আহকাম যে ইবাদত, তা শুধু আমাদের আমল থেকেই নয়; বরং আমাদের ধ্যান-ধারণা থেকেও দূরে সরে গেছে।

তাই ফরজ ইবাদত, বাহ্যিক পবিত্রতা, বিয়ে-শাদি-সম্পর্কিত মাসাইল যতটুকু গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়, এদিকে তার সিকিভাগও মনোযোগ দেওয়া হয় না। আমাদের দ্বীনী মজলিস, বক্তৃতা, ওয়াজ মাহফিল আর সীরাতের আলোচনায় দ্বীনের কিছু আংশিক মাসাইল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা হয়। কিন্তু মানুষের সম্মান, বান্দার হক আদায়, ইসলামী আদব-আখলাকের পাবন্দী, লেনদেনের সততা, সৃষ্টিসেবার সওয়াব এবং তাতে শিথিলতা প্রদর্শনের শাস্তির উপর এসব মাহফিলে খুব কমই আলোকপাত করা হয়। অনুরূপ যখন আমরা চারিত্রিক অধঃপতন নিয়ে আলোচনা করি, তখন কিছু বড় বড় দোষ নিয়ে আলোচনা করি; কিন্তু ওই দোষ–যা বান্দার হক নষ্ট করার সাথে সম্পৃক্ত, তা নিয়ে আলোচনা করি না।

আমরা চুরি-ডাকাতি, মদপান, ব্যভিচার, খুন-জখমকে তো অপরাধ মনে করি এবং আসলেই এগুলো মারাত্মক অপরাধ; কিন্তু কারো হক নষ্ট করা বা কারো হক আদায় না করা, অত্যাচারীর সাহায্য করা, সুদ খাওয়া, ঘুস নেওয়া, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, পরনিন্দা বা পরচর্চায় লিপ্ত হওয়া, অযথা কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে ততটা গুরুত্ব দিই না। অথচ এগুলোও অনেক বড় অপরাধ; বরং এসব অপরাধ তো মানুষের নেকী বরবাদ করে দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে আজ ইসলামী শরীয়তের পরিপূর্ণ ফায়দা মুসলিম সমাজে পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের প্রতি ততটুকু আকর্ষণ অনুভব করছে না—যতটুকু সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিলো।

অথচ এসব খোদাদ্রোহী ও বস্তুপূজারি ভাগ্যাহত মানুষদেরকে ঈমান ও ইসলামের দিকে একমাত্র আমাদের আখলাকই আকর্ষণ করতে পারে।

সাধারণ জনগণের জন্য আজ আমরা সামান্য যে সহানুভূতি ও সেবার মনোভাব প্রদর্শন করি, তা সাধারণত রাজনীতির ব্যানারে হয়ে থাকে। সেটাকে আমরা দ্বীনের অংশ, ঈমানের চাহিদা বা আখেরাতে সওয়াবপ্রাপ্তির আশায় করি না। আমাদের এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে, ইবাদত-বন্দেগীর পাবন্দী, যিকির-আযকারের আধিক্য নিশ্চয় সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মাধ্যম; কিন্তু এসবের দ্বারা শুধু ব্যক্তি-উৎকর্ষ সাধিত হয়, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কিন্তু খেদমতের দ্বারা সওয়াবপ্রাপ্তি, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে সাথে সামাজিক ভালোবাসাও অর্জন করা যায়। ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ সমাজে অনুভূত হয়। অধিক ইবাদতের দ্বারা মানুষের মনে এক ধরনের সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করা যায়, কিন্তু তাদের অন্তরে ভালোবাসার জজবা পয়দা হয় না। কিন্তু যারা মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী, সমাজ সেবায় নিয়োজিত—জনসাধারণের মনে তাদের মর্যাদাবোধ ছাড়াও ভালোবাসার জজবা পয়দা হয়। এ জজবা শুধু এ খেদমতগার ব্যক্তির জন্যই নয়; বরং ধীরে ধীরে তার ধর্ম, মত ও পথ এবং আহ্বানের প্রতিও সৃষ্টি হয়। কিন্তু শর্ত হলো, খেদমতের সাথে-সাথে এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরা এখানে কিছু নেওয়ার তুলনায় অধিক দেওয়ার জন্য এসেছি। আমার উদ্দেশ্য এটা নয়, আমরা এসব খেদমত নিজেকে জনগণের নিকট প্রিয় করার জন্য করবো; বরং উদ্দেশ্য হলো, যেন খেদমতের ভেতরগত ফলাফলের সাথে সাথে তার বাহ্যিক ফলাফলও প্রকাশ পায়। হাদীসে নববীর দ্বারাও এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং জ্ঞাতিদের মনে রেখো—যাতে যার সাথে যে সম্পর্ক আছে, সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করা যায়। এই আচরণ ও সহানুভূতির ফলস্বরূপ পরিবার-পরিজনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হবে। ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত হবে এবং মৃত্যুর পরেও সে স্মরিত হতে থাকবে।' (তিরমিযী)

চিন্তা করার বিষয়, যখন আত্মীয়-স্বজনের খেদমত করার এ লাভ, যেখানে সাধারণত কিছু না কিছু স্বার্থ থাকেই, তাহলে সেসব বিধবা,

এতীম ও দুস্থ মানুষের সেবা—যাদের সাথে আমাদের মনুষ্য-সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো রক্তের বন্ধন নেই, সেবার কারণে তাদের অন্তরে আপনার প্রতি কতটুকু ভালোবাসা সৃষ্টি হবে?

আপনারা হয়তো এ কথার সাথে একমত হবেন যে, আমরা যদি আমাদের দ্বীনদারীকে মাখলুকের খেদমত, জনসাধারণের সেবা, মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করা এবং সর্বপ্রকারের সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যয় করি, তাহলে এর দ্বারা একদিকে মুসলিম সমাজে যেমন নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, অপরদিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও আমাদের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হবে। যদি আকৃষ্ট হয়, তবে ভেদাভেদের এ দেয়াল আর থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি হবে না।

এ ছাড়াও এর দ্বারা দেশব্যাপী বিশাল এক দাওয়াতী কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হবে। যে ব্যক্তি কিছুটা হলেও নিজেকে খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, তিনিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। এখানে আমার ব্যক্তিজীবনের একটি ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা যায়।

আজমগড় শহরে যে বাড়িতে আমি স্ত্রী-পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতাম, সে বাড়ির সামনেই এক হরিজনের কাঠের আড়ত ছিলো। তার পরিবারের লোকজন আমাদের বাসায় বিভিন্ন সময় যাতায়াত করতো। একদিন বিকেলবেলা আমি কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে দেখি ওই হরিজনের স্ত্রী কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করায় সে বললো, 'আমার স্বামীকে কোতোয়াল পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।' আমি বললাম, 'ভয় পেয়ো না। আমি থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখব।' আমি আসরের নামায পড়ে দোকানে গিয়ে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে তারা বললো, 'রেশনের দোকান থেকে একটা ছেলে এক লোকের শস্যভর্তি বস্তা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে ধাওয়া করলে সে ওই কাঠের আড়তে বস্তা ফেলে রেখে চম্পট দেয়। তাই পুলিশ ওই ছেলেকে না পেয়ে এ লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। কেননা বস্তা এর দোকানেই পাওয়া গেছে।'

ঘটনা শুনে আমি শেরওয়ানি গায়ে দিয়ে রিকশা নিয়ে থানায় চলে গেলাম। এর আগে কখনও থানায় যাওয়ার সুযোগ হয়নি। রিকশা থেকে

নেমে থানার সামনের খোলা জায়গায় আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তির মতো পায়চারি করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দারোগা সাহেব বেরিয়ে এলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এখানে কেন পায়চারি করছেন?' আমি বললাম, 'ওই যে লোকটা হাজতের কাছে বসে আছে, তার সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।' দারোগা সাহেব বললেন, 'কী বলতে চান বলুন।'

আমি তাকে মূল ঘটনা খুলে বললাম। সে আমার কথা বিশ্বাস করলো। এক পুলিশকে ডেকে ধমক দিয়ে বললো, 'ওই লোককে খামোখা বসিয়ে রেখেছ কেন? মৌলভী সাহেবের সাথে যেতে দাও।' আমি তাকে রিকশায় বসিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বাসায় ফিরে এলাম। এ সামান্য খেদমতের ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আজ প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও সেই হরিজন এবং তার ছেলে-মেয়েরা আমার সাথে এমন ব্যবহার করে, যেন আমি তাদের বিরাট কোনো উপকার করেছি। তার ছেলেরা আমার পা ছুঁয়ে আদাব জানাতে আসে। কেউ চাকরি পেলে হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসে। আমিও তাদের নিজ সন্তানের মতো স্নেহ করি। অন্যের কাছে তারা বলে বেড়ায়, ইনি মানুষ নন—দেবতা।

এ অনুভূতির সূত্র ধরে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ভাবছিলাম—সমস্ত মুসলমান বিশেষ করে আলেম-উলামা, ছাত্র-শিক্ষক তথা শিক্ষিত সমাজের সামনে বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সৃষ্টির সেবা যে ইবাদতেরই শামিল—এ কথা ফুটিয়ে তুলতে হবে; যাতে তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ সেবার অদম্য স্পৃহা জেগে ওঠে। তারই ফলশ্রুতিতে আমার এ রচনা।

এর দ্বারা অন্যান্য উপকারের সাথে সাথে একটা বিশেষ ফায়েদা এ-ও হবে যে, আদব-আখলাক-সম্পর্কিত অনেক দ্বীনী হুকুম—যার উপর আমরা আমল করতে পারছি না বা করলেও ইবাদতের নিয়তে করছি না, সেসবের উপর আমল করার তাওফীক নসীব হলে মনের ভেতর অনাবিল এক খুশির হিল্লোল বয়ে যাবে। যেমন ধরুন, আপনি যখন কোনো এতিমের লালনপালন, কোনো দুস্থের সাহায্য অথবা নিঃস্বার্থ কোনো কাজ করবেন, তখন মনে মনে খুশি এবং তৃপ্তি অনুভব

করবেন। তবে যেকোনো সেবা বা খেদমত অবশ্যই এমন পন্থায় হতে হবে, যেন এতে তার কোনো অপমান না হয়। তার মনে যেন কোনো আঘাত না লাগে। এমন ভাব যেন না হয়, আমি তার উপর বড় দয়া দেখাচ্ছি, তাহলে এ খেদমত করতে গিয়ে পদে পদে যে কষ্ট আসবে, মনের বিরুদ্ধে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, সেগুলোতে সবর ও ধৈর্যশক্তি আসবে। প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করে নেওয়া সহজ হবে এবং এটাই হবে নফসের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ, যা একটি ইবাদত। এমতাবস্থায় অন্যের দুঃখ-দুর্দশা, অসহায়ত্ব দেখে নিজের অসহায়ত্বের কথা মনে পড়বে। এখন চিন্তা করে দেখুন, সামান্য একটু খেদমতের বিনিময়ে আপনি কত উপকার লাভ করলেন, শরীয়তের কতগুলো হুকুমের উপর আপনার আমল হয়ে গেল। এর দ্বারা আরেকটি ব্যাপক ফলাফল আমাদের সামনে আসবে; তা হলো, ইসলাম আজ আমাদের মসজিদ-মাদরাসার মধ্যে যেভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, সে গণ্ডি থেকে বেরিয়ে তা মানুষের আমলী যিন্দেগীতেও পরিলক্ষিত হবে। এটা অন্যদের জন্য এমন দাওয়াত ও তাবলীগ হবে, যা বড় বড় পুস্তক রচনা বা বক্তৃতা করেও বাস্তবায়ন করা যেত না।

এভাবে যখন আমরা সমাজের খেদমতে নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগ করবো, তখন এর সওয়াবের দিকটাও আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। সমাজে এর গুরুত্ব অনুভূত হবে। মুখে কেউ স্বীকার না করলেও অন্তরে অন্তরে সবাই বলতে বাধ্য হবে, ইসলামের অনুসারী আর আখেরাতের পথিকের এমনটিই হওয়া উচিত।

কবি বলেন, ‘সৃষ্টিজগতের সেবার মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া যেতে পারে। এ পথ শুধু যিকির, তাসবীহ আর কম্বল পরিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।’

অন্যের প্রতি সহানুভূতি আর সহমর্মিতার জন্যই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নতুবা শুধু ইবাদতের জন্য অন্যান্য মাখলুক কি কম ছিলো?

কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত মানুষকে একই পিতা-মাতার সন্তান এবং আল্লাহ তাআলার পরিবারভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মানুষের প্রতি এ দয়া, সেবা ও সহানুভূতি তো মুসলিম জাতির দৌলত ছিলো; কিন্তু আজ তা খ্রিষ্টান মিশনারিসহ অন্যান্য সম্প্রদায় হাতিয়ে নিয়েছে।

বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা যৌক্তিক হবে বলে মনে করি।

১. আল্লাহ তাআলা সূরা নিসায় ইরশাদ করেন, 'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করে থাকো এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো।'

২. রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সমস্ত মানুষ আদমেরই বংশধর। আর আদম আ.-কে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো।'

৩. অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবার। আল্লাহ পাকের নিকট সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে সৃষ্টিজীবের সাথে ভালো আচরণ করে।' (বায়হাকী)

৪. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ পাক তার উপর দয়া করেন। জমিনবাসীদের উপর দয়া করো, তাহলে আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের উপর দয়া করবেন।'

৫. অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনের দেহ-মন পুরোটাই স্নেহ-মমতার ভান্ডার হবে। ওই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে অপরকে ভালোবাসে না এবং তাকেও অন্যরা ভালোবাসে না।'

৬. যে ব্যক্তি শুধু আত্মশুদ্ধির চিন্তায় মগ্ন হয়ে সার্বিক পরিবর্তনের চিন্তাকে দূরে ঠেলে দেয়, তাদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'যে মুসলমান সমাজের সাথে মেলামেশা করে, তাদের কষ্ট বরদাশত

করে, সে ওই মুসলমানের চেয়ে ভালো, যে সমাজকে পাশ কাটিয়ে চলে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টও বরদাশত করে না। (মেশকাত)

একথা আমাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, কুরআনের পয়গাম শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়; বরং তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এজন্যই কুরআন শরীফে আন-নাস শব্দ দুই শতাধিক জায়গায় এবং ইনসান শব্দ ষাটেরও অধিক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। আর মুসলিম শব্দ শুধুমাত্র চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুরূপ নবীগণের দাওয়াত ও তাবলীগের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে বারবার 'সালাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সালাম অর্থ 'শান্তি-নিরাপত্তা'। এ শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত-তাবলীগের ভিত্তিই ছিলো মানুষের প্রতি সহানুভূতি-সহমর্মিতা এবং তাদের শান্তি-নিরাপত্তার উপর। গোটা ইসলামী শিক্ষাই একে ঘিরে আবর্তিত হয়। স্বয়ং ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। সুতরাং এটা স্পষ্ট, ইসলামী শিক্ষার এ ব্যাপকতা বোঝার জন্য খেদমত ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহর ও বান্দার হক মিলেই ইসলাম। আল্লাহর হকের সীমা যতটুকু না বিস্তৃত, বান্দার হকের পরিধি তার চেয়েও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। আল্লাহ তাআলার হকের মধ্যে কমতি হয়ে গেলে আশা করা যায় তিনি স্বীয় রহমতের গুণে তা ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু বান্দার হক আদায়ে কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে সে ব্যক্তি মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ পাক মাফ করবেন না। সুতরাং এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অথচ আজ আমাদের সমাজে এদিকেই যত ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইমাম নববী রহ. কিতাবুল আযকারে লেখেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় গোনাহ থেকে তওবা করতে চায় এবং তার সে গোনাহ আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার জন্য তিনটি শর্ত। যথা : ১. গোনাহ ছেড়ে দেবে, ২. এ কৃতকর্মের জন্য সে অনুতপ্ত হবে, ৩. ভবিষ্যতে আর গোনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে। আর এ গোনাহ

যদি বান্দার হক সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার তওবার জন্য উল্লিখিত তিন শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত হলো, যার ব্যাপারে এ ক্রুটি হয়েছে—তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

যেমন, কাউকে গালি দিয়েছে, কারো দোষ চর্চা করেছে, কারো উপর অত্যাচার করেছে, কাউকে বিনা কারণে মারধর করেছে, কারো নিকট থেকে ঘুস নিয়েছে, অথবা কারো টাকা-পয়সা জায়গা-জমি আত্মসাৎ করেছে, এসব ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেবে এবং যে জিনিস নিয়েছিলো তা ফেরত না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না। বান্দার হক আদায় না করে যদি সে মারা যায়, তাহলে কেয়ামতে তার নেকী দ্বারা বদলা দেওয়া হবে।

দুনিয়ায় কোনো জাতির উত্থান-পতন আল্লাহর হকের মোকাবিলায় বান্দার হক আদায় না করার উপরেই আবর্তিত হয়।

পশ্চিমা সমাজ তাদের ব্যক্তিগত জীবনে শত-সহস্র অপরাধে ডুবে থাকলেও সমষ্টিগতভাবে কিন্তু তারা সততার পরিচয় দিয়ে থাকে। লেনদেনের মধ্যে বিশ্বস্ততা পরিলক্ষিত হয়। কাজে-কর্মে ফাঁকি, শঠতা, ধোঁকা ইত্যাদি থেকে তাদেরকে সাধারণত দূরে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, মহামারি ইত্যাদি সময়ও তারা সাধ্যানুযায়ী জানমাল নিয়ে জাতির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাদের মুসলিম সরকাররা যার এক দশমাংশও করে না; বরং ত্রাণসামগ্রী লুটেপুটে নিজের পকেট ভারী করতে ব্যস্ত থাকে। এজন্যই ব্যক্তিগত জীবনে তারা হাজার অপকর্মে ডুবে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াবী যিন্দেগীতে অনেক উন্নত হতে পেরেছে।

পক্ষান্তরে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সামান্য কিছু ভালো কাজ করলেও সমষ্টিগতভাবে হাজার অপরাধে অপরাধী। তাই আমরা পতনের দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হয়েছি।

সুতরাং এ বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, দুনিয়ার বুকে উন্নতি অগ্রগতির জন্য শুধুমাত্র আল্লাহর হক আদায়

করলেই হবে না; বরং তার সাথে সাথে ব্যক্তিগত এবং সামাজিকভাবে বান্দার হকও যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

এজন্যই শাহ আবদুল আযীয রহ. বলেছেন, 'ঈমান ও কুফরীর কারণে রাজত্ব যায় বা আসে না; বরং জুলুম ও ইনসাফের ভিত্তিতে বাদশাহী আসে বা যায়।'

এ সম্পর্কে জাপানের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক জাপান সফরে যান। জাপানের জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে তার আলোচনা হয়। আলোচনার এক ফাঁকে ভারতীয় সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের দেশে বিশেষ কোনো সমস্যা আছে কি না?' জাপানি ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের দেশে দুধের উৎপাদন কম। তাই সারা দেশে আমরা সুষ্ঠুভাবে দুধ সাপ্লাই করতে পারি না।' ভারতীয় সাংবাদিক বললেন, 'দুধের মধ্যে কিছু পানি মিশিয়ে নিলে হয়তো সমস্যা অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে।' জাপানি ভদ্রলোক বললেন, 'খবরদার! আপনি আমার বন্ধু বলে এমনটা বলতে পারলেন। অন্য কারো নিকট বলবেন না, নির্ঘাত খুন হয়ে যাবেন।'

এ উপমহাদেশে মুসলমানরা শত শত বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। ইংরেজরাও এ দেশে প্রায় দু'শত বছর শাসন করেছে। মুসলমানরা রাজ্যহারা হয়েছে আজ দু'শত বছর, আর ইংরেজরা ক্ষমতার মসনদ থেকে বিদায় নিয়েছে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ বছর। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মনে মুসলমানদের উপর যে ঘৃণা-বিদ্বেষ আর ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, তা ইংরেজ বা খ্রিষ্টানদের উপর নেই। এর কারণ কী? আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আমরা এ দেশে (ভারত) আমাদের স্বীয় রাজনৈতিক উন্নতির যে বিশাল ইতিহাস, কৃষ্টি সভ্যতার যে বিরাট ধ্যান-ধারণা রেখেছি, সাধারণ মানুষের সেবা-সহানুভূতি আর ভালোবাসার ক্ষেত্রে সেরকম ব্যাপক বিস্তৃত কোনো ইতিহাস গড়তে পারিনি। সুতরাং আমাদের জন্য সেবার দিকটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারেনি।

পক্ষান্তরে ইংরেজরা স্বীয় রাজনৈতিক প্রাধান্য অর্জনের সাথে সাথে সারা দেশে জনসেবার একটি জীবন্ত ইতিহাস রেখে গেছে। বড় বড় লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ, হাসপাতালসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আজ সকলের চোখে পড়ে। তারা এসব সেবামূলক কাজের দ্বারা এ দেশের জনগণের মনের যতটুকু জয় করেছে, আমরা ততটুকুও জয় করতে পারিনি।

মুসলমানদের মধ্যে পীর-দরবেশ, মুজাহিদদের এমন এক দল ছিলো—যারা নিজেদেরকে জনকল্যাণমূলক কাজে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে তারা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তাই তাদের প্রতি শত্রুতার বদলে ভক্তি-শ্রদ্ধা আজও বিধর্মীদের অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে। তাদের মাজারে মুসলমানদের তুলনায় অমুসলিমদের সংখ্যাই এখন বেশি। এটা ঠিক না বেঠিক—সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয়; কিন্তু এ সকল পীর-বুযুর্গদের সাথে তাদের এত মহব্বত এ কথাই প্রমাণ করে, এ সব কিছুই তাদের খেদমত ও ত্যাগের ফল। অন্যদিকে কোনো রাজা-বাদশাহর কবরে এভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ফুল ছিটাতে কাউকে দেখা যায় না, অথচ তাদের জীবিতাবস্থায় তাদেরকে ঘিরেই মানুষের আনাগোনা ছিলো বেশি। তাই বর্তমানের এ বস্তুবাদী সভ্যতার যুগে এবং দেশের বিরাজমান এ পরিস্থিতিতে স্নেহ-মমতা, সেবা-সৌহার্দের মাধ্যমেই মাখলুকের অন্তরে স্থান করে নিতে হবে।

কোনো এলাকা যদি মুসলিম-জনশূন্য হয়ে যায়, তাহলে সেখানকার অন্যান্য অধিবাসীরা আপনাদের অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারবে? পারবে না। কেননা আপনারা সেবা-সহানুভূতির মাধ্যমে তাদের মন জয় করতে পারেননি। আপনাদের দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোনো উপকার তারা পায়নি। তাই আপনাদের থাকা আর না-থাকা সমান। এটা সত্যিই আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। এদেশে (ভারত) আমরা আজ ৫০-৬০ বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে মর্যাদা লাভ করতে চাচ্ছি, অথচ এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তার থেকে বেশি আমাদের হারাতে হয়েছে। তাই সেবার মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এতক্ষণ যা কিছু বলা হলো এবং সামনে যা বলা হবে, তার অর্থ মোটেও এটা নয় যে, আমরা নামায-রোযা-যিকির ইত্যাদি ইবাদতকে ছোট করে দেখছি; বরং এগুলো তো থাকবেই, তার পাশাপাশি খেদমতের গুরুত্বও যেন আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বর্তমানে যে সকল দল দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, যে প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিবর্গ শিক্ষা-দীক্ষা এবং আত্মশুদ্ধির পথে মেহনত করছেন—তারা যেন এ খেদমতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাদের কাজের একটি অংশ বানিয়ে নেন। শিক্ষিত ভাইয়েরা তাদের পরিচিত ও প্রভাবের মঞ্চে, উলামা-মাশায়েখ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা ওয়াজ-মাহফিলে, দরস-তাদরীসে এ বিষয়টার উপর গুরুত্ব সহকারে আলোকপাত করে এর নমুনা পেশ করবেন। বিশেষ করে আমাদের মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে যদি খেদমতের এ জযবা পয়দা হয়ে যায় এবং তারা ছাত্র বা অন্য কারো দ্বারা খেদমত গ্রহণের পরিবর্তে নিজের কাজ নিজের হাতেই করেন, এদিকে সাধারণ মানুষের খেদমতের মাধ্যমে যদি এ সুন্নতকে জীবিত করেন, তাহলে প্রতি বছরই হাজারো মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। সমাজে নীরব এক চারিত্রিক বিপ্লব সাধিত হবে।

এজন্য বুযুর্গদের মতো বিনয়-নম্রতা এবং সাদাসিধে জীবনযাপনে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে।

আমিও যেহেতু মৌলভী, সুতরাং এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, প্রত্যেক মাদরাসা এবং সেখানকার শিক্ষকদেরই নিজস্ব একটা রাজত্ব থাকে। যেখানে ছোট একটি রাষ্ট্রের মতো আনুষঙ্গিক বিষয় এবং খাদেম-খুদ্দামও থাকে। অথচ মাদরাসা থেকে বেতন নেওয়ার পর আমাদের জন্য ছাত্র বা অন্য কারো থেকে খেদমত গ্রহণ করা উচিত নয়।

অবশ্য আমরা যদি তাদের উপর কিছুটা এহসান করতে চাই, কোনো অপরাগতা থাকে অথবা খেদমতের জন্য কাউকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে খেদমত গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

এটা এই কারণে যে, ছাত্ররা যখন মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়ে অধিকাংশই মসজিদ বা মাদরাসার খেদমতে আত্মনিয়োগ করে, তখন তাদের মনেও পূর্ব মানসিকতা অনুযায়ী খেদমত করার চাইতে খেদমত পাওয়ার জন্যই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

এতে নিজেদের ফায়েদা হলেও অন্যরা ফায়েদা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই ছাত্রদের ব্যক্তিবিশেষের খেদমতে নিয়োজিত হওয়ার তুলনায় জাতি ও সমাজের খেদমতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমরা যদি আমাদের মেজাজ ধীরে ধীরে এভাবে গড়ে তুলি, তাহলে জাতি ও সমাজ অনেক উপকৃত হবে।

আমাদের মন-মানসিকতা এভাবে গড়ে তোলা এজন্যই জরুরি যে, এটা আমাদের দ্বীনী কাজ, পাশাপাশি বর্তমান যুগের চাহিদাও। তাই সেবা নেওয়ার চাইতে সেবা করার উপরে আমরা জোর দেব। উদ্ধত না হয়ে অবনত হবো। ইনশাআল্লাহ, এ মনোভাব তৈরি হয়ে গেলে যে ইজ্জত এবং ভক্তি-ভালোবাসা অর্জিত হবে, তা খেদমত গ্রহণের মনোভাবে যে সম্মান হতো—তার চেয়ে অনেক বেশি হবে।

আমরা যেভাবে ছাত্রদের থেকে শারীরিক এবং অন্যান্য খেদমত গ্রহণ করি, আমাদেরও উচিত শিক্ষাগত খেদমত ছাড়াও তাদের খেদমত করা। যেমন, সে যদি আমাকে প্রতিদিন আমার খানা এনে দেয়, তাহলে আমারও উচিত হবে কখনও কখনও নিজের দস্তরখানায় বসিয়ে নিজ হাতে পরিবেশন করে তাকে খাওয়ানো। সে যদি রোগে-শোকে আমার খেদমত করে, তাহলে আমারও উচিত হবে তার অসুস্থতায় তারই খেদমত করা। অসুখের সময় শুধু 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করে নেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তার জন্যও ততটুকু করা দরকার, যতটুকু আমরা নিজ সন্তানের জন্য করি।

এখন আরও জরুরি একটি কথা জেনে রাখা দরকার, সেবা গ্রহণের মনোভাব থেকেই আমাদের সমাজে বিশেষ করে দ্বীনী মাদরাসাসমূহে মনোমালিন্য এবং ভাঙনের সৃষ্টি হয়। আমাদের মাদরাসাগুলোতে কেউ খাদেম হতে রাজি নয়। নিজের গণ্ডিতে সকলেই মাখদুম হতে আগ্রহী।

তাই এটা স্পষ্ট যে, সবাই যখন মাখদুম হতে চাইবে, তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। সুতরাং নিজের মধ্যে যদি খেদমতের জযবা পয়দা করা যায়, তাহলে অনেক অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

সাধারণভাবে এটাও পরিলক্ষিত হয়, আমরা আপন আপন পছন্দনীয় তথা মত-পথের বা স্বীয় দলের মানুষের জন্য তো খেদমত করতে কুণ্ঠাবোধ করি না। কিন্তু অন্য দলের বা ধর্মের বা অপছন্দনীয় ব্যক্তির জন্য আমরা খেদমতের কোনো পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে পারি না। অথচ আমাদের খেদমত পরিচিতদের তুলনায় অপরিচিতের মধ্যেই বেশি হওয়া দরকার। কেননা অন্যের খেদমতের জন্য মানুষকে নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, নিজের সম্মান-প্রতিপত্তিকে ত্যাগ করতে হয়। পক্ষান্তরে নিজের লোকদের খেদমতে মনে এক ধরনের আনন্দের উদ্রেক হয়। সেখানে কিছু না কিছু স্বার্থও লুকিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অন্যের খেদমতে নিশ্চয় বেশি সওয়াবের অংশীদার হওয়া যাবে।

এখানে মনে রাখতে হবে, খেদমতকে ইবাদত হিসেবে মনে স্থান দেওয়া এবং জীবনের গাড়িকে এ পথে পরিচালিত করা খুব সহজ নয়; বরং এখানে ক্রোধদমন, দৃঢ়তা, এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। নেকী অর্জনের জন্য তো এ পথ খুবই সহজ, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে যেহেতু কোনো ফলাফল আমাদের সামনে আসবে না, তাই নিরাশ হয়ে এ রাস্তা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। টানা এ খেদমতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। দীর্ঘকালের মেহনতের পরে আল্লাহ পাক চাইলে নেকী অর্জনের সাথে সাথে দুনিয়াতেও তার কিছু ফলাফল সামনে আসবে।

ইবাদতের ব্যাখ্যা এবং তার ব্যাপকতা

ঈমান-আকীদা ঠিক করে নেওয়ার পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওইসব ফরজ ইবাদত—যাকে আমরা 'আরকানে আরবাআ' বলে জানি, অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এসব ইবাদত শুধু ফরজই নয়; বরং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এসব ফরজের সাথে সাথে সুন্নাত, নফল, যিকির, তাসবীহ তেলাওয়াত ইত্যাদিকে

সংযোগ করে নিলে ফরজের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। শুধু ফরজ আদায় আর নফলের পাবন্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার আরও পথ রয়েছে। সাধারণত আমরা 'আরকানে আরবাআ' এবং বেশি থেকে বেশি যিকির-আজকারকেই ইবাদত মনে করে থাকি। অথচ আমাদের ফিকহের কিতাবসমূহে ফরজ ইবাদত শুধু এ চারটিই নয়; বরং পাঁচটির কথা উল্লেখ রয়েছে—আর সেটা হচ্ছে জিহাদ। পার্থক্য শুধু এতটুকু, 'আরকানে আরবাআ' ফরজে আইন আর জিহাদ ফরজে কেফায়া। জিহাদ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে আন্দাজ করা যায়, কখনো কখনো জিহাদের ফযীলত ফরজে আইনের চেয়েও বেশি হয়ে যায়।

জিহাদের এ ফযীলত এ জন্যই এত বেশি যে, এটা ইবাদতের সাথে সাথে একটা খেদমতও বটে। এর মধ্যে দ্বীনের জন্য দাওয়াত ও চেষ্টা, দেশ ও সীমান্ত রক্ষা, সব ধরনের সৈনিকের খেদমত, জালেমের অত্যাচার থেকে দুর্বলদের বাঁচানো ইত্যাদি শামিল। আর এর মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা হলো শহীদের।

আরকানে আরাবাআর একটি বিশেষ রুকন হচ্ছে যাকাত। যা শুধুমাত্র বান্দার হক। কুরআনে পাকের মধ্যে যাকাত-সদকার আলোচনা যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে, নামায-রোযার আলোচনা তেমনভাবে করা হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবনে নামাযের যতটুকু গুরুত্ব রয়েছে, যাকাতের গুরুত্ব ততটুকু নেই।

অনুরূপ বিবাহ-শাদী যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শরীয়ত এটাকেও ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। এটি ইবাদত হওয়ার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সন্তানের লালন-পালন, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের খেদমত এবং তাদের হক আদায়কে কুরআন-হাদীসে সওয়াবের কাজ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে বলা হয়েছে। আর ইবাদতের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এটাই, মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়ত, কারণ হলো এই, মানুষ বিবাহের কারণে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা এবং শরীয়তবিরোধী কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এর কারণেই স্নেহ-মমতা এবং সহানুভূতির মনোভাব গড়ে ওঠে। আর এসব জিনিস আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে। বিবাহের মাধ্যমেই আল্লাহর বান্দাদের খেদমত এবং তাদের হক আদায় করা শুরু হয়। এর দ্বারাই সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক যথা, উত্তরাধিকার, ওসিয়ত ইত্যাদির হুকুম আরোপিত হয়। এ কারণেই মানুষ নিজেকে চিনতে পারে। আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি হয়।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে কেউ বললেন, আপনি তাকওয়ার উপর একটি কিতাব লিখুন। তিনি জবাব দিলেন, 'আমি কিতাবুল বুয়ু অর্থাৎ বেচাকেনা এবং অন্যান্য লোকদের সম্পর্কে কিতাব লিখেছি।' উদ্দেশ্য ছিলো এই, লেনদেন ও আচার-আচরণে মানুষ যখন হালাল-হারাম-মাকরুহ ইত্যাদি ব্যাপারে পাবন্দী করবে, তখনই সে মুত্তাকী হতে পারবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, আমানতদার ব্যবসায়ীর হাশর নবী এবং সিদ্দীকীনদের সাথে হবে। মোটকথা, প্রত্যেক ওই কাজ যা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সওয়াবের নিয়তে করা হবে—সেটাই ইবাদত। তার দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। হাদীসে এ-ও বলা হয়েছে, যে খাবার তুমি নিজে খাও, সেটাও সদকা, বিবি-বাচ্চাকে খাওয়ালে সেটাও সদকা। অর্থাৎ দান-সদকা করলে যেমন সওয়াব পাওয়া যায়, অনুরূপ কেউ যদি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য শরীয়ত অনুযায়ী খরচ করে, তাহলে সে-ও সওয়াব পাবে।

মাখলুকের সেবা করাও ইবাদত

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়েছে, ইবাদতের গণ্ডি শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার পরিধি আরও বিস্তৃত। উল্লিখিত আমলসমূহ যেমন আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপায়, তদ্রূপভাবে ঈমান ও বিশ্বাসের পরিপক্বতা, ইবাদত পালনের

সাথে সাথে বান্দার হকসমূহকে সঠিকভাবে আদায় করাও নেক আমলের মধ্যে শামিল। কখনো কখনো সামান্য খেদমত দ্বারা অতি সহজে যেভাবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়, ততটা নামায-রোযার দ্বারাও কিন্তু হয় না। সুতরাং আমাদেরকে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না; বরং আল্লাহর বান্দাদের খেদমতকেও দ্বীনের জরুরি অংশ মনে করতে হবে।

অনেক সময় মাখলুকের খেদমতকে নামায-রোযার মতো ইবাদতের উপরও প্রাধান্য দিতে হয়। যদি নামায-রোযার উপর অগ্রাধিকার দিয়ে সে কাজটা না করা হয়, তাহলে নামায পড়েও মানুষ গোনাহগার হয়। যেমন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে এবং তার প্রবল ধারণা হচ্ছে, নামায শেষ করতে করতে এক অন্ধ ব্যক্তি কূপের ভেতর পড়ে যেতে পারে, তাহলে নামায ছেড়ে ওই অন্ধকে বাঁচানো তার জন্য জরুরি। এক ব্যক্তি পিপাসায় কাতর, পাশে এক ব্যক্তি যিকিরে মশগুল, তার জন্য জরুরি হচ্ছে, যিকির ছেড়ে পিপাসার্ত ব্যক্তির জন্য পানির ব্যবস্থা করা। এক প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতর, আর আমি রাতভর তাহাজ্জুদে মগ্ন রইলাম, কিন্তু আমার ওই তাহাজ্জুদের চেয়ে অনাহারী প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়া উত্তম।

মেহমানের খাতিরে নফল রোযা ছেড়ে তার সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে হাদীসে বলা হয়েছে। ইমাম নববী রহ. যিকিরের ফযীলত বয়ান করার পর বললেন, 'যিকিরের ফযীলত শুধু তাসবীহ আর হামদ-সানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক ওই কাজ—যা আল্লাহর জন্য করা হয়, তাই যিকির।' অতঃপর তিনি ওইসব অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেখানে যিকির ছেড়ে খেদমতে আত্মনিয়োগ করা বেশি উত্তম। শর্ত হলো, শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়ত হতে হবে। হিজরী ষষ্ঠ শতকের মুজাদ্দিদ হিসেবে পরিচিত শায়খ ইজ্জুদ্দীন বিন আবদুস সালাম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাওয়ায়েদুল আহকাম'-এ লেখেন, 'কোনো ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচানো আল্লাহ্ তাআলার নিকট নামায পড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ জন্য যে, ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে পরে নামায কাজাও পড়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু আগে নামায পড়তে গেলে ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে তো আর বাঁচানো যাবে না।

অনুরূপ রমযান মাসে যদি কাউকে ডুবে যেতে দেখে আর রোযা ভেঙে ফেলা ছাড়া ওই ব্যক্তির কোনো সাহায্য করা সম্ভব না হয়, তাহলে রোযা ভেঙে ওই ডুবন্ত ব্যক্তির সাহায্য করতে হবে। কেননা, মানুষের প্রাণের মধ্যে হক্কুল্লাহ আর হক্কুল ইবাদ দুটোই রয়েছে। আর রোযা শুধু হক্কুল্লাহ। তাই রোযার উপর কারো জান বাঁচানোকে প্রাধান্য দিতে হবে।' (১ম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা)

উপরে আলোচনা হয়েছে, ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ইবাদত। কুরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে ঈমানের আলোচনার পরে ইবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম বান্দার হক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে, 'কল্যাণ শুধু পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রকৃত কল্যাণ ওই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর উপর, আখেরাতের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং আম্বিয়া কেরামের উপর ঈমান এনেছে এবং জানমালের মহব্বত থাকা সত্ত্বেও তা আত্মীয়-স্বজন, এতীম, গরীব, মুসাফির সাহায্যপ্রার্থীগণ এবং দাস মুক্তির জন্য খরচ করেছে। নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্যধারণ করে। এরাই ওই সকল লোক—যারা সত্য পরায়ণ এবং মুত্তাকী।' (১১৭-২২ রুকু)

এ আয়াতে ঈমানের পরে বান্দার হকের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মালের প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও খরচ করে। মাল খরচ করার জায়গা শুধু নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং গরীব-মুসাফির সাহায্যপ্রার্থী এবং দাস মুক্তির জন্যও খরচ করতে হবে।

অতঃপর ইসলামী সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষার কথার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা হলো, ওয়াদা বা অঙ্গীকার। এ প্রতিশ্রুতি পালন শুধুমাত্র দু'ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বলয় পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপরে নামায-রোযার আলোচনা শেষে বলা হয়েছে—এসব লোকই সত্যপরায়ণ এবং আল্লাহভীরু।

সূরা বালাদের মধ্যে আল্লাহ পাক বান্দার হককে সবচেয়ে উঁচু ঘাঁটি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর সে ঘাঁটির বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন : গোলাম আযাদ করা, এতিম-গরীবদের ক্ষুধার সময় আহার জোগানো।

কুরআনে পাকে ওইসব লোকের কঠোর সমালোচনা করেছে—যারা নিজেরাও গরীবের সাহায্য করে না, এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয় না।

আল্লাহ পাক বান্দার হক আদায় করার উপর গুরুত্বারোপ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি; বরং বান্দার হক আদায়কে স্বীয় হক আদায় করা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

কোনো ব্যক্তি যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায-রোযা আদায় করে, তাহলে তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তার ওই আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবে না। অনুরূপ যাকাত ও সদকা—যা শুধু বান্দার হক, সেটাও যদি লোক দেখানোর জন্য হয়, তাহলে তা-ও তার জন্য শাস্তির কারণ হবে। এর দ্বারা বুঝে এলো, লোক দেখানো কাজ যেমনভাবে আল্লাহর হকের মধ্যে গোনাহ, অনুরূপ বান্দার হকের মধ্যেও গোনাহ। সুতরাং বান্দার হক আদায় করার মধ্যেও ইখলাস এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন লক্ষ্যবস্তু হতে হবে।

স্মরণ রাখা দরকার, কুরআনে কারীমে প্রত্যেক জায়গায় ঈমানের পরে নেক আমলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে নেক আমল কী? তা কি শুধু নামায-রোযার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নাকি পূর্ণ শরীয়তের উপর আমল করার নাম? যদি পূর্ণ শরীয়তের উপর আমল করার নামই আমলে সালেহ বা নেক আমল হয়, তাহলে আমরা যখন দ্বীন বা দ্বীনদারীর কথা বলি, তখন আমাদের চিন্তা-চেতনা শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করার দিকেই ধাবিত হয় কেন? আল্লাহর বান্দাদের হক আদায় বা তাদের খেদমতের দিকে আমাদের খেয়াল কেন যায় না যে—এটাও একটা নেক আমল ও ইবাদত।

এক ব্যক্তি হারাম পথে আয় করে; কিন্তু সে নামায, রোযা, যিকির ইত্যাদি ইবাদতে খুবই পাবন্দ। আমরা তাকে দ্বীনদার মনে করি। পক্ষান্তরে এক

ব্যক্তি ফরজ-সুন্নাত আদায় করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে। তাকে কিন্তু আমরা দ্বীনদার মনে করি না। এক ব্যক্তিকে আমরা নামায শেখাই, সেটাকে দ্বীনের কাজ মনে করি। অন্য এক ব্যক্তিকে রোজগারে লাগানোর চেষ্টা করি, কিন্তু সেটাকে দুনিয়ার কাজ মনে করি।

নিম্নে কুরআনে পাকের কিছু আয়াত এবং কিছু হাদীস নকল করা হয়েছে। যার দ্বারা অতি সহজেই বুঝে আসবে, ঈমান ও ইখলাসের সাথে ছোট একটা খেদমত যত সহজে মানুষকে জান্নাতের অধিকারী করতে পারে, অনেক দীর্ঘ ইবাদত দ্বারাও তা হাসিল করা সম্ভব হয় না।

যাকাত ও সদকা একটি ইবাদত, কিন্তু কেউ যদি যাকাত দিয়ে খোঁটা দেয় বা তাকে ছোট মনে করে, তাহলে তার এ ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ কোরো না।'

অনুরূপ নামায একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কিন্তু নামায যদি দুর্বলের সেবা আর তাদের সাথে সহমর্মিতা থেকে খালি হয়, তাহলে তা হয় মুনাফিকদের নামায। আল্লাহ পাক সূরা মাউনে ইরশাদ করেন, 'আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? সে ওই ব্যক্তি যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহিত করে না, অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর—যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর। যারা লোক দেখানোর জন্য নামায আদায় করে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না।'

আল্লাহর বান্দাদের খেদমত ও সেবা সবচেয়ে উঁচু ঘাঁটি। তাতে চড়েই মুমিন বান্দাকে জান্নাতে যেতে হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

'বস্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি। অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। আপনি জানেন সে ঘাটি কি? তা হচ্ছে দাস মুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন দান, এতীম, আত্মীয় অথবা ধুলি-ধূসরিত মিসকীনকে।' প্রথমটা অবশ্যই দ্বীনের কাজ, তবে দ্বিতীয়টাও

তো কোনো অংশে কম নয়। কেননা হালাল আয় না থাকার কারণেই মানুষের ধর্মীয় আর নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে, সে হিসাব কে রাখে?

এত কথা বলার অর্থ হচ্ছে, আমরা দ্বীনদারীর ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত সীমিত করে ফেলেছি। আমাদের কাজ দ্বারাও আমরা এটা প্রমাণ করেছি, দ্বীনদারী শুধুমাত্র নামায-রোযাসহ কিছু সহজ আমল করার নাম। অথচ মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি, ভালো ব্যবহার এবং মানুষের হক আদায় করাও এক রকম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত—যেমন নামায, রোযা, ফরজ, নফল ইবাদাতের মধ্যে কমতি করলে নিজের ব্যক্তিগত সওয়াব কমে যাবে; কিন্তু বান্দার হক আদায়ে যদি শিথিলতা করা হয়, তাহলে নামায-রোযার সওয়াব তো কমবেই সাথে পাওনাদারদেরকে তার নেকী কর্তন করে দিয়ে দেওয়া হবে এবং সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।

রোযা রাখা অবস্থায় পানাহার করা বা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা হারাম। কিন্তু আপনি যদি ভুলে এ কাজ করেন, তাহলে আপনার রোযা ভাঙবে না। ওদিকে রোযা অবস্থায় আপনি যদি কারো গীবত করেন বা কাউকে গালি দেন, তাহলে আপনার রোযা মাকরূহ হয়ে যাবে। অনেক উলামায়ে কেরামের মতে গীবত দ্বারা রোযা নষ্টও হয়ে যায়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক সাহাবী দু'জন মহিলা সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, যাদের একজন নামায-রোযাসহ বিভিন্ন নেক আমল করে; কিন্তু অন্যকে কষ্ট দেয় বা গালি দেয় ইত্যাদি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে জাহান্নামী।' অন্য মহিলা যে সাধারণভাবে ফরয ইবাদতগুলো আদায় করে এবং রোযা রাখে; কিন্তু প্রতিবেশীর হক আদায় করে, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কাউকে গালি দেয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সে জান্নাতী।'

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার প্রশ্ন করলেন যে, 'গরীব কে?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'যার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই, সে গরীব।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'গরীব ওই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা আর অসংখ্য নেকী নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে মেরেছিলো, কাউকে গালি দিয়েছিলো, কারো উপর অপবাদ দিয়েছিলো, কারো মাল আত্মসাৎ করেছিলো। তার সমস্ত নেকী ওসব হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যখন তার নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন অন্যের গোনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (মিশকাত শরীফ, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

মোটকথা হলো, এমন কাজ যা মানুষের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়, বা তাদের কোনো হক সম্বন্ধে উদাসীন করে, তা হারাম অথবা মাকরূহ। হেরা গুহায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পয়গাম পেলেন, এ দায়িত্বপূর্ণ কাজের যথার্থতা অনুভব করে বিচলিত হয়ে উঠলেন, তাঁর অন্তর কেঁপে উঠল। কোনো রকম বাড়ি পৌঁছে হযরত খাদিজা রা.-কে বললেন, 'আমার গায়ে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমার ভয় হচ্ছে।' হযরত খাদিজা রা. তাঁর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা শান্ত হওয়ার পর হেরা গুহার পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত খাদিজা রা. তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কয়েকদিন একাধারে বাড়ি ফিরতেন না। কিন্তু হযরত খাদিজা রা. সান্ত্বনা দেওয়ার সময় তাঁর ওই সব ইবাদত, যিকির ও মুজাহাদার কথা উল্লেখ না করে তাঁর ওই সব চারিত্রিক গুণাবলি এবং সৃষ্টির সেবার কথা উল্লেখ করলেন, যা খোদার সাহায্য প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। তিনি বললেন, 'খোদার কসম! এ রকম কখনই হবে না, আল্লাহ পাক আপনাকে অপমান-অপদস্থ করতে পারেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের বোঝা বয়ে দেন, গরীব-অসহায়দের সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারি করেন। সমস্ত ভালো কাজে আর মানুষের বিপদে সাহায্য করেন।' (বুখারী শরীফ)

ঠিক একই কথা বলছিলেন মালেক ইবনে দাগিনা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. যখন কুরাইশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে বেরিয়ে এসেছিলেন। কিছুদূর আসার পরেই সাক্ষাৎ হলো মালেক ইবনে দাগিনার সাথে। তিনি বললেন, 'হে আবু বকর! কোন দিকে বেরিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার গোত্রের লোকের অত্যাচার আমার জন্য অসহ্য হয়ে পড়ছে, মক্কায় থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না, তাই বেরিয়ে পড়েছি মক্কা ছেড়ে।' তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'কুরাইশরা আপনার মতো একজন মানুষের সাথে এরকম করছে?'

'আপনি তো সমাজের সৌন্দর্য ও গর্ব। বিপদে-আপদে মানুষের সাহায্য করেন, ভালো কাজ করেন, গরীবের খবরদারি করেন। আপনি ফিরে চলুন মক্কায়। আমার জিম্মায় আসবেন আপনি।'

মালেক ইবনে দাগিনাহ মুসলমান ছিলেন না, হযরত আবু বকর রা.-এর সাথে তার কোনো আত্মীয়তাও ছিলো না; বরং অন্যান্য কুরাইশদের মতো সে-ও ইসলামের কট্টর দুশমন ছিলো। কিন্তু হযরত সিদ্দীকের চারিত্রিক মাধুর্য আর সেবার কারণে তার সাহায্যকারী হয়ে গেল। এর দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহর সাহায্য চারিত্রিক গুণাবলি আর সৃষ্টির সেবার কারণে যতটুকু আসে অন্য কোনো কারণে ততটুকু আসে না।

সেবার মাধ্যমে মানুষের মন যতটুকু জয় করা যায়, অন্য কোনো মাধ্যমে তা হয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে নবুওয়াতের দায়িত্ব এ উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই এ উম্মাতকে ইবাদত-বন্দেগীর সাথে সাথে খেদমতের জযবাও পয়দা করতে হবে। নতুবা আমাদের চেষ্টা ও ফলাফল সীমাবদ্ধ থাকবে।

হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো যিন্দেগীকে আমরা এ নমুনা হিসেবে দেখতে পাই, তিনি ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের খেদমত করতেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন। ঘরের বাইরে মাখলুকের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন, বন্ধু-বান্ধবদের কুশলাদী, অসহায়দের খোঁজখবর,

অসুস্থের সেবা, মুসাফির আর মেহমানদের মেহমানদারী তাঁর জীবনের মহান ব্রত ছিলো। বিভিন্ন সাহাবা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবারাত্রির যে কর্মতালিকা বর্ণনা করেছেন, তার দিকে আমরা একবার নজর বুলিয়ে নিতে পারি। হযরত আয়েশা রা.-কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে কী করতেন? জবাবে তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের মতোই থাকতেন, নিজের কাপড় ইত্যাদি নিজেই পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজ নিজেই করতেন।'

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে,

'তিনি পরিবার-পরিজনের খেদমত করতেন, নামাযের সময় হলে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেন,

'এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি ছাগল চরাননি।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও কি ছাগল চরিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ছাগল চরাতাম।' (বুখারী)

হযরত আলী রা. যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। নবুওয়াতের শুরু থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্ততপক্ষে তেইশ বছর তাঁর খেদমতে ছিলেন। হযরত হুসাইন রা. একদিন তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও স্বভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বললেন,

'তিনি হাসি মুখ, নম্র স্বভাব ও দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন। কঠোর স্বভাব ও সংকীর্ণ হৃদয়ের ছিলেন না। কথায় কথায় কলহ করতেন না, ছিদ্রান্বেষী ও ক্ষুদ্রমনা ছিলেন না। কোনো কথা তাঁর পছন্দ না হলে তা থেকে বিরত থাকতেন। তার কাছে কেউ কোনো কিছু চাইলে তিনি নিরাশ করতেন না। না-মঞ্জুরীর কথাও প্রকাশ করতেন না, অর্থাৎ প্রকাশ্যভাবে নিষেধ বা প্রত্যাখ্যান করতেন না; বরং তা পূরণ করা সম্ভব না হলে নীরব থাকতেন। ফলে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নীরবতার মধ্যেই

উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারত। তিনি নিজের জীবন থেকে তিনটি জিনিসকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দিয়েছিলেন। যেমন, পরস্পর কটুতর্ক করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা এবং লক্ষ্যহীন কোনো কিছুর পেছনে লেগে থাকা। অপর লোকদের ক্ষেত্রেও তিনি তিনটি বিষয়ে সংযমী ছিলেন। কাউকে মন্দ বলতেন না, কাউকে দোষারোপ করতেন না এবং কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতেন না। যে কথা মানুষের কল্যাণকর, সেটাই শুধু বলতেন। কথোপকথনের সময় সাহাবীগণ এমন নীরব ও নতশিরে তা শুনতেন, মনে হতো তাদের মাথায় যেন পাখি বসে আছে। যখন তাঁর কথা বলা শেষ হতো, তখন সাহাবীগণ পরস্পরে কথাবার্তা বলতেন। কেউ কোনো কথা বলা আরম্ভ করলে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নীরবে শুনে যেতেন। যে কথায় মানুষ হাসতো–তিনি সে কথায় মুচকি হাসতেন। যে বিষয়ে মানুষ বিস্মিত হতো–তিনিও তাতে বিস্মিত হতেন। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি তার সাথে ঔদ্ধত্যের সাথে কথা বললে তিনি সহ্য করে নিতেন। লোকমুখে নিজের প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না।

কিন্তু যদি কেউ তার অনুগ্রহ ও দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, তিনি তা গ্রহণ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি তার কথা বলা শেষ না করতো, ততক্ষণ তার মাঝে ছেদ টানতেন না। তিনি অত্যন্ত উদার সত্যবাদী ও অতিশয় নম্র স্বভাবী ছিলেন। তাঁর সাহচর্য ছিলো মহোত্তম। তাঁর এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ছিলো যে, অকস্মাৎ দেখলে অন্তর কেঁপে উঠত। কিন্তু পরিচিতি যতই ঘনিষ্ঠ হতো, ততই ভালোবাসা দৃঢ়তর হতো।'

ইসলামী শরীয়তে মাখলুকের সেবার গুরুত্ব কত বেশি তা নিম্নের হাদীসটি দ্বারা আন্দাজ করা যায়।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক মাখলুকের খেদমতকে নিজের খেদমত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মেশকাত শরীফের ইবাদত অধ্যায়ে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা

করোনি। বান্দা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আপনি তো সারা বিশ্বের প্রতিপালক, রোগ থেকে মুক্ত। আপনার সেবা কীভাবে করবো? আল্লাহ পাক বলবেন, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিলো, কিন্তু তুমি তার সেবা করোনি, যদি তার সেবা করতে, তাহলে সেখানে আমাকে পেতে।

পুনরায় বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে আহার করাওনি। সে বলবে, হে রব আপনাকে কীভাবে খাওয়াবো, আপনিই তো বরং সকলকে মাখলুককে রিজিক দান করেন। আল্লাহ পাক বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলো, তাকে যদি খাওয়াতে, তাহলে তার প্রতিদান আমার নিকট পেতে।'

দীর্ঘ হাদীসে কুদসীর এটি ক্ষুদ্র একটি অংশ যে, হাদীসের মধ্যে আল্লাহ পাক এভাবে অনেক বস্তু ও জাগতিক খেদমত এবং ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যাতে বান্দার সহজেই অনুমতি হয়, আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে আসল পথ হলো, আল্লাহর বান্দাদের খেদমত করা।

অন্য এক হাদীসের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়ে বলেছেন, 'মুসলমানদের উপর অমুক অমুক খেদমত ওয়াজিব। যেমন, ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, অসুস্থের সেবা করা, মজলুমের সাহায্য করা, বন্দিদের মুক্তির চেষ্টা করা, দাস-মুক্তি কাজে অংশগ্রহণ করা। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ উপকার পায়।'

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম, এক ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল এক বাহনে উঠে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। বাহনটি এত দুর্বল ছিলো, চলতে পারছিলো না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বললেন,

'যার নিকট অতিরিক্ত বাহন আছে, সে যেন এ ব্যক্তিকে একটি বাহন দেয়। যার নিকট সফরের সামান্য খাদ্য পানি ইত্যাদি বেশি আছে,

সে যেন ওই ব্যক্তিকে কিছু দেয়-যার নিকট কিছুই নেই। এভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত প্রকারের মালের কথা বলা শুরু করলেন। এমনকি আমরা একথা বুঝতে লাগলাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের মধ্যে আমাদের কোনো হকই নেই।' (মুসলিম শরীফ)

সাহাবায়ে কেরাম বর্ণনা করেন, আমরা সফরে যখন কোনো মঞ্জিলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আসতাম, তখন আমাদের বাহনের পিঠের হাওদা খুলে তাদের আরামের ব্যবস্থা না করে অন্য আমল তথা নামায ইত্যাদিতে মশগুল হতাম না। (আবু দাউদ)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন, 'সফরের মধ্যে যে (সাথিদের) বেশি খেদমত করবে সে সরদার। একমাত্র শাহাদাতের মর্যাদা ছাড়া অন্য কোনো আমলের মর্যাদা তাকে অতিক্রম করতে পারবে না।' মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের দুটি ব্যাখ্যা করেন। এক. সরদার আমীরের স্বীয় সাথিদের সকল প্রয়োজনের দিকে যথাযথ খেয়াল রাখা উচিত। দুই. যে খেদমত করে, সে আমীর হওয়ার উপযুক্ত, সে সাধারণ মানুষই হোক না কেন।

পরিবার-পরিজনের খেদমত সাধারণত আমরা সকলেই করি। কিন্তু মুরব্বীদের খেদমত, দুর্বল পিতামাতার খেদমত, এতীম, গরীব, বিধবা তথা সাধারণ মানুষের খেদমতের গুরুত্ব আমাদের সমাজে খুবই কম গুরুত্ব রাখে। নিজের সন্তান-সন্ততি ছাড়া আমরা অন্যের ব্যাপারে এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না, উপার্জনশীল পিতামাতার সামান্য কিছু খেদমত যদিও আমরা করি; কিন্তু অসহায় পিতামাতাকে আমরা চাকরের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করি। অথচ হাদীসে স্পষ্ট রয়েছে, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সাহাবীকে মায়ের খেদমতের নিমিত্তে হিজরত এবং জিহাদ থেকেও বিরত রেখেছেন।

এতীম-গরীব আর বিধবাদের সম্বন্ধে ইরশাদ হচ্ছে, 'বিধবা ও গরীবের খোঁজখবর যে নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর মতো এবং ওই

তাহাজ্জুদ আদায়কারীর মতো, যে তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয় না, এবং ওই রোযাদারের মতো, যে সর্বদা রোযা রাখে।' (বুখারী-মুসলিম)

এতীমের ব্যাপারে বলেছেন, 'এতীমের প্রতিপালনকারী বেহেশতে আমার এত নিকটে থাকবে, যেমন মধ্যমা আর তর্জনী আঙুলদ্বয় কাছাকাছি আছে।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় যখন কোনো সাহায্যপ্রার্থী বা মুখাপেক্ষী আসত, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'সে যদি নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করে, তাহলে তোমরা তার প্রয়োজনের কথা আমার কাছে উপস্থাপন করো।'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

'যদি কোনো মুসলমান তার অপর ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে আল্লাহ পাক তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। যদি কোনো মুসলমানের বিপদ দূর করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার মুসীবতকে দূর করে দেবেন।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো এক ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রওনা হলো। পথিমধ্যে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিলেন, ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় রওনা হয়েছেন? সে বললো, অমুক জায়গায় অমুক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার উপর কি তার কোনো ইহসান আছে নাকি, যার বদলা দিতে রওনা হয়েছেন? সে বললো না, শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে আমি ভালোবাসি। ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ পাকের দূত। আল্লাহ পাক তোমাকে ওই রকম ভালোবাসেন যেমন তুমি তাকে ভালোবাসো। (আল আদাবুল মুফরাদ)

হাদীসে এসেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি কোনো এক জায়গায় যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে তার পিপাসা লাগে। সামনে

একটি কূপ দেখতে পায়। কূপ থেকে পানি উঠানোর কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ে না, তাই সে কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করে। উপরে এসে দেখে একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। জিহ্বা দিয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবলো, পিপাসায় আমি যেমন কষ্ট পাচ্ছিলাম কুকুরটাও নিশ্চয় সেরকম কষ্ট পাচ্ছে। সে আবার কূপের ভেতর নামলো। নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে দাঁতে চেপে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরকে পানি পান করালো। আল্লাহ পাক তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মাফ করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পশুর খেদমতেও কি সওয়াব রয়েছে?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'প্রত্যেক জানোয়ারের খেদমতেই সওয়াব রয়েছে।'

অপর এক হাদীসে আছে, একজন নারীকে শুধু এজন্যই আযাব দেওয়া হবে যে, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিলো। পরে পিপাসায় বিড়ালটি মারা যায়। আযাব দেওয়ার সময় ফেরেশতা তাকে বলবে, তোমাকে এজন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে, তুমি বিড়ালটি বেঁধে রেখে নিজেও খেতে দাওনি, আর তাকে ছেড়েও দাওনি যে, সে পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত। উপরে আলোচনা হয়েছে, বান্দার হক আদায় শিথিলতা করা নামায-রোযার সওয়াবকেও কমিয়ে দেয় এবং মানুষ শাস্তির উপযুক্ত হয়। যেমন, হাদীসের মধ্যে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'অমুক নারীর সম্বন্ধে বলা হয়, সে অত্যন্ত নামাযী, রোযাদার, দান-খয়রাতে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু তার মধ্যে একটি দোষ রয়ে গেছে। তা হচ্ছে, সে তার জিহ্বা দ্বারা প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে জাহান্নামী।'

অন্য এক নারী সম্বন্ধে আলোচনা হলো, সে নামায-রোযা তেমন করতে পারে না (ফরজ ওয়াজিব ছাড়া); কিন্তু সে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সে মহিলা জান্নাতী।'

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত জিবরাঈল আ. প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য এত বেশি তাগিদ দিয়েছেন, আমি ভাবতে লাগলাম হয়তো অচিরেই তাকে আমার ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হবে।

প্রতিবেশী মুসলিম হোক বা অমুসলিম—উভয়ের হক সমান। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর বাড়িতে একবার ছাগল যবেহ হয়। তিনি খাদেমকে দু'বার জিজ্ঞাসা করলেন, ইহুদী প্রতিবেশীকে এর থেকে ভাগ পাঠানো হয়েছে কি না। খাদেম এতে আশ্চর্য হলে তিনি তাকে উপরোল্লিখিত হাদীস শোনান।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'কেয়ামতের দিন অনেক লোক তার প্রতিবেশীকে ধরে আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করবে যে, আমি কোনো প্রয়োজনে এর বাড়িতে গেলে সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো।' প্রতিবেশীর গণ্ডি শুধু দুই এক ঘরের মধ্যেই সীমিত নয়। যার সাথে সম্পর্ক বা পরিচয় আছে, সে শুধু প্রতিবেশী নয়; বরং প্রতিবেশীর সীমা অনেক বিস্তৃত। হযরত হাসান বসরী রা.-কে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলো প্রতিবেশীর সীমা কোন পর্যন্ত? তিনি বললেন, নিজের ঘরের আগে পিছে ডানে বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত। (আদাবুল মুফরাদ)

হযরত আবু যর গিফারী রা. কোথাও যাচ্ছিলেন, সাথে গোলামও ছিলো। উভয়ের শরীরে একই সাইজের লম্বা জামা ছিলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, চাকরের সাথে কি পোশাকেও সমতা রাখা জরুরী? আপনি যা পরেছেন তাকেও তাই পরিয়েছেন? তিনি বললেন, একবার আমি তাকে কটু কথা বলে ফেলেছিলাম। সে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অভিযোগ করলে হুযুর আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি তার মা সম্বন্ধে কোনো ব্যঙ্গমূলক কথা বলেছ? আমি অকপটে

স্বীকার করলাম। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে তোমার মনিব-সম্পর্কীয় ভাই। আল্লাহ্ পাক তাকে তোমার অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মনিব-সম্পর্কীয় ভাই যে কারোর অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে ওই জিনিসই খাওয়ায়—যা নিজে খায়। ওই জিনিস পরিধান করায়—যা সে নিজে পরিধান করে। এত বেশি কাজ দিয়ো না, যাতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যদি কোনো কঠিন কাজ করাতে হয়, তাহলে নিজেও তাতে শরীক হও।' (আদাবুল মুফরাদ)

ঈমানের সংজ্ঞা আমাদের চিন্তা চেতনায় খুবই সীমিত অর্থে ভেসে ওঠে, অথচ ঈমান-বিল্লাহর পরিধি অনেক বেশি সম্প্রসারিত। হাদীসে এসেছে, ঈমানের ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। আর সর্বনিম্ন শাখাটি হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। লজ্জাও ঈমানের একটি বিশেষ শাখা।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বারজাহ আসলামী রা. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন—যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মানুষের চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (কাটা-ইট) সরিয়ে দাও।' (আদাবুল মুফরাদ)

হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত এ বাণীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে আসল পথ এবং জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে নিকটতম রাস্তা হচ্ছে বান্দার কষ্ট দূর করা। একথা খুবই স্পষ্ট, রাস্তা থেকে ইট-পাথর বা কষ্টদায়ক বস্তু উঠিয়ে দেওয়ার যখন এ ফযীলত, তখন স্বয়ং বান্দার কোনো দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলে, তাদের খেদমত করলে কত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে।

এতীমের লালন-পালনকারী সম্বন্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুসংবাদ দিয়েছেন, তা অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে খুব কমই দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'আমি এবং এতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে

এমনভাবে অবস্থান করবো। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দুই আঙুল একত্র করে দেখালেন অর্থাৎ, মধ্যমা ও তর্জনীর মধ্যে যেমন বেশি দূরত্ব নেই; অনুরূপ আমি এবং এতীমের প্রতিপালনকারী নিকটে অবস্থান করবো।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'জান্নাতী লোক তিন ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে এক রকম হলো, যে দয়ালু, বিনয়াবনত এবং প্রত্যেক মুসলমান ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বিনম্রচিত্ত হয়।' (মিশকাত)

একথাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই বিধবা সম্বন্ধে বলেছেন, 'যে কষ্ট করে নিজের সন্তানদেরকে লালন-পালন করে।'

হযরত ইবনে উমর রা. এবং আরো অনেক সাহাবী কোনো এতীম-গরীবকে সাথে না নিয়ে আহার করতেন না। সাহাবায়ে কেরামের জীবন ইবাদত ও খেদমতের সমষ্টিতে পূর্ণ ছিল। তাদের খেদমতের ঘটনা একত্রিত করলে বিশাল এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। এসব হযরত প্রশাসনেও খেদমতের উত্তম নমুনা ছিলেন। হযরত উমর ফারুক রা. যার পদভারে রোম-পারস্য পর্যন্ত কম্পমান থাকত, তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন।

গভীর রাতে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে ফিরে প্রজাদের খবর নেওয়া তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিলো। তাঁর সেসব ঘটনা থেকে একটি ঘটনা স্মরণীয়। একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি কিছু উট নিয়ে রওনা হলেন। হযরত উসমান গণী রা. এ দৃশ্য দেখে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন! গ্রীষ্মের এ প্রচণ্ড গরমে উট নিয়ে আপনি কোথায় রওনা হয়েছেন? তিনি বললেন, এগুলো যাকাতের উট। পানি পান করাতে নিয়ে চলেছি। হযরত উসমান রা. বললেন, এ কাজ তো কোনো গোলাম দ্বারা করানো যেত! তিনি বললেন, উসমান! একটি উটও যদি পিপাসার্ত থেকে যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন আমাকেই জিজ্ঞাসা করা হবে, গোলামকে নয়। সে সময় কি উত্তর দেব?'

হযরত সালমান ফারসী রা. ইরাকের গভর্নর ছিলেন। কিন্তু নিজের ঘোড়ার দানাপানির ব্যবস্থা নিজের হাতেই করতেন। অন্যান্য সাহাবীদেরও একই অবস্থা ছিলো। নিজের এবং অন্যের কাজ করতে বিন্দুমাত্রও সংকোচ করতেন না। কিন্তু আমাদের অবস্থা! অন্যের খেদমত তো পরে, আমরা নিজের কাজ করতেও লজ্জায় বাঁচি না।

এ বৈশিষ্ট্য সাহাবা-তাবেয়ীনদের পরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলেম-উলামাদের ছিল। ধীরে ধীরে ইবাদতের এ ব্যাপকতা রহিত হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তাবে-তাবেয়ীনদের মধ্যমণি ছিলেন। তার জীবনের কিছু ঘটনা খেদমতে খলক সম্পর্কিত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. আলেম হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। তাঁর কারবার অনেক বিস্তৃত ছিলো। তাঁর এ ব্যবসার উদ্দেশ্য মাল-দৌলত কামাই করা ছিলো না; বরং তার উদ্দেশ্য ছিলো মাখলুকের সেবা বেশি থেকে বেশি যাতে করা যায়।

হযরত ফুজায়েল ইবনে আয়াজ একদিন তাঁকে বললেন, আপনি তো আমাদেরকে দুনিয়ার প্রতি অনুৎসাহিত করে থাকেন, দুনিয়া থেকে দূরে থাকতে বলেন। অথচ নিজে মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা করেন। তার দ্বারা উপকৃত হন। তিনি বললেন, 'হে ফুজায়েল! আমি এ ব্যবসা এজন্য করে থাকি, যাতে নিজেকে বিপদ থেকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে অপদস্থ-অপমান হওয়া থেকে বাঁচাতে পারি। আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে এর সাহায্য নিতে পারি এবং আল্লাহ তাআলা আমার উপর যে আর্থিক খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন–তাতে অগ্রগামী হতে পারি।'

একবার ফুজায়েলকে বললেন, 'যদি তোমরা না থাকতে, তাহলে আমি এ ব্যবসা করতাম না। অর্থাৎ তুমি ও তোমার সাথিদের যেন অর্থ দ্বারা খেদমত করতে পারি সেজন্যই এ ব্যবসা। যেসব ছাত্র-শিক্ষক দ্বীনী ইলমচর্চায় মশগুল অথচ তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই সংকীর্ণ তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করতেন এবং যথাযথ আর্থিক সাহায্য করতেন। এ উদ্দেশ্যে আশেপাশের শহরে তিনি হাজারো দিরহাম পাঠিয়ে দিতেন।

কেউ তার নিকট অভিযোগ করল, আপনি বাইরের লোকদের জন্য যত টাকা খরচ করেন নিজের শহরের লোকদের জন্য তো এত টাকা খরচ করেন না! তিনি বললেন, আমি ওই সকল লোকদের জন্য মাল খরচ করি, যাদের ইলম-আমল এবং সত্যবাদিতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত আছি। তারা দ্বীনী ইলমের প্রচার-প্রসারে ব্যস্ত রয়েছে। অথচ তাদের সাংসারিক প্রয়োজনও রয়েছে। এখন তারা যদি সংসারের খরচ যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ইলম নষ্ট হয়ে যাবে। আর আমরা যদি তাদের সাহায্য করি, তাহলে ইলমচর্চা বাকি থাকবে। নবুওয়াতের পরে ইলমে দ্বীনের প্রচারের চেয়ে বড় আর কোনো কাজ নেই।' তার এ দান শুধু আলেম-উলামার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; বরং ছোট-বড় আলেম-জাহেল সকলেই সমানভাবে উপকৃত হতো। এক ব্যক্তির সাতশত দিরহাম ঋণ ছিলো। লোকেরা তাঁর নিকট সুপারিশ করল, আপনি তার ঋণ পরিশোধ করে দিন। ইবনে মুবারক খাজাঞ্চিকে লিখে পাঠালেন, 'এ লোককে সাত হাজার দিরহাম দিয়ে দাও।' ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পত্র নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে গেলে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার কত দিরহামের প্রয়োজন?' ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বললো, 'আমি সাতশত দিরহামের ঋণে আবদ্ধ আছি।' কিছু লোক ইবনে মুবারকের কাছে সুপারিশ করলে তিনি এ চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। খাজাঞ্চি মনে মনে ভাবল ইবনে মুবারক হয়তো ভুলে সাত হাজার লিখে ফেলেছেন। তাই সে ওই ব্যক্তিকে বললো, 'চিঠিতে কিছু ভুল মনে হচ্ছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি লোক পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিই।' সে ইবনে মুবারকের কাছে চিঠি লিখলো, 'পত্রবাহক সাতশত দিরহাম চায় অথচ আপনি সাত হাজার লিখেছেন। কোনো ভুল হয়নি তো?' ইবনে মুবারক তৎক্ষণাৎ জবাবে লিখলেন, আমার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে ওই লোককে চৌদ্দ হাজার দিরহাম দিয়ে দাও।' খাজাঞ্চি কিছুটা হিতাকাঙ্ক্ষীর মনোভাব নিয়ে লিখলো, 'আপনি যদি এভাবে মাল বিলি করতে থাকেন, তাহলে কোষাগার অচিরেই শূন্য হয়ে যাবে।' খাজাঞ্চির এ অযাচিত উপদেশ তাঁর পছন্দ হলো না।

তিনি একটু কঠোরভাবে লিখলেন, 'তুমি যদি আমার অধীনস্থ হয়ে থাকো, তাহলে আমি যে আদেশ দিচ্ছি–তা পালন করো। আর যদি আমাকে তোমার অধীনস্থ মনে করে থাকো, তাহলে আমার জায়গায় এসে বসে হুকুম করো। তোমার সব হুকুম আমি মানবো।'

আমার সামনে দুনিয়াবী ধন-সম্পদের তুলনায় আখেরাতের সম্পদ বেশি মূল্যবান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় কোনো মুসলমান ভাইকে অকল্পিতভাবে খুশি করবে, তাকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবেন। ওই ব্যক্তি আমার কাছে সাতশত দিরহাম চেয়েছিলো। আমি ভাবলাম তাকে যদি সাত হাজার দিই, তাহলে সে এ অকল্পিত অর্থ পেয়ে খুশি হবে। আর হাদীস অনুযায়ী আমিও ক্ষমা পেয়ে যাবো।' পুনরায় চিঠিতে তিনি ১৪ হাজার এজন্য দিতে বললেন, ওই ব্যক্তি সাত হাজারের কথা জানতে পেরেছিলো, তাই এবার ১৪ হাজার তার জন্য অকল্পিত হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা বলেন, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রা. অনেক সময় সিরিয়ার তরতুস নগরীতে আসতেন। পথিমধ্যে তাকে রাত কাটাতে হতো। যে সরাইখানায় তিনি অবস্থান করতেন সেখানে এক যুবক থাকত। যতক্ষণ তিনি সরাইখানায় অবস্থান করতেন ওই যুবক তাঁর নিকট হাদীস শুনতো এবং খেদমত করতো। একবার তিনি সরাইখানায় এসে উক্ত যুবককে পেলেন না। খবর নিয়ে জানতে পারলেন ঋণের দায়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ঋণদাতা এবং ঋণের পরিমাণ জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, ওমুক ব্যক্তি তার উপর দশ হাজার দিরহাম পাওয়ার দাবি করে। উক্ত দিরহাম পরিশোধ করতে অপারগ হওয়ায় তাকে আটক করা হয়।'

ইবনে মুবারক রহ. উক্ত ব্যক্তিকে নির্জনে ডেকে বললেন, 'তুমি ওই দশ হাজার দিরহাম আমার কাছ থেকে নিয়ে যুবককে ছেড়ে দাও। এবং কসম খাও যে, এ তথ্য কারো কাছে ফাঁস করবে না।' সে ব্যক্তি রাজি হয়ে গেল। ইবনে মুবারক যুবকের মুক্তির ব্যবস্থা করে সে রাতেই সরাইখানা ছেড়ে চলে গেলেন। যুবক মুক্তি পাওয়ার পর সরাইখানায়

এসে তার আগমনের এবং চলে যাওয়ার খবর পেলো। তাঁর সাথে দেখা না হওয়ায় সে খুব দুঃখিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ তরতুসের দিকে রওনা হলো। বেশ কিছু দূর গিয়ে সে হযরত ইবনে মুবারকের দেখা পেলো। তিনি তার ঘটনা শুনলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুক্তি পেয়েছো কীভাবে?' নওজোয়ান বললো, 'কোনো আল্লাহর বান্দা সরাইখানায় এসেছিলো। সে ঋণ পরিশোধ করে মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আমি তাকে চিনি না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া আদায় করো, তিনি তোমাকে এ মুসিবত থেকে নাজাত দিয়েছেন।' তাঁর মৃত্যুর পর সে লোক যার থেকে তিনি কসম নিয়েছিলেন, এ ঘটনা তিনি মানুষের নিকট বয়ান করে।

সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের যুগে প্রতিবেশী, এতিম-গরীবদের খেদমতের যে গুরুত্ব ছিলো, তা আমরা হযরত হাসান বসরী রহ.-এর বর্ণনা থেকে জেনে নিতে পারি। ইমাম বুখারী রহ. তার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি মুসলমানদের এমন এক যুগ প্রত্যক্ষ করেছি যে, এক ব্যক্তি প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই স্বীয় পরিবার-পরিজনকে বলত, "এতিমের প্রতি লক্ষ্য রেখো। প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রেখো। এখন তোমার মধ্যে থেকে নেক লোকেরা বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। আর তোমরা ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছো।"'

সাধারণভাবে কারো আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করাকে আমরা সদকা বলে মনে করি, অবশ্যই এটা বড় সদকা। কিন্তু সদকার বিষয়টি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা আরও বেশি ব্যাপক-বিস্তৃত।

হাদীসে এরশাদ হচ্ছে, 'স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় মুচকি হাসি দেওয়াও সদকা। ভালো কথা বলাও সদকা। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা। পথ হারিয়ে ফেলা কোনো ব্যক্তিকে পথের দিশা দেওয়াও সদকা। কোনো অন্ধকে পথ দেখিয়ে দেওয়াও সদকা। রাস্তা থেকে পাথর-হাড়-কাঁটা বা কোনো কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়াও সদকা। নিজের পাত্র থেকে অন্যের পাত্রে পানি ঢেলে দেওয়াও সদকা অর্থাৎ, এ সকল কাজেই সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। (তিরমিযী)

দুই ব্যক্তি বা দলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য হয়ে গেলে নিজেকে তার থেকে দূরে রাখাকে আমরা প্রশংসনীয় মনে করি, অথচ আমাদের এ নেতিবাচক কাজ আল্লাহ্ পাকের পছন্দনীয় নয়; বরং তিনি আদেশ দিচ্ছেন আমরা যেন নিজ উদ্যোগে ওই ভগ্ন দুই হৃদয়কে জুড়ে দিই। তামাশা না দেখি। কোনো এক দল যদি মানতে না চায়, তাহলে তার উপর নিজের আর্থিক ও চারিত্রিক প্রভাব খাটিয়ে তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসি। এটা সমাজের জন্য বিরাট বড় খেদমত।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে যদি মতবিরোধ হয়ে যায় আর তারা লড়াইয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও।' (সূরা হুজরাত)

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেবো না, যা মর্তবার দিক দিয়ে নামায-রোযার চেয়ে ঊর্ধ্বে?' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'নিশ্চয় বলুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!' ইরশাদ হলো, 'পরস্পরে সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং ঠিক করে দেওয়া। আর দুই দিলের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে যাওয়া দ্বীনের জন্য মন্দনীয়।' অর্থাৎ ক্ষুর যেমন মাথার চুলকে মুণ্ডিয়ে দেয়, পরস্পরে দ্বন্দ-ফাসাদও দ্বীনকে সেভাবে মুণ্ডিয়ে দেয়।

এ যাবত কুরআন-হাদীসের আলোকে বান্দার হক এবং মাখলুকের খেদমতের যে গুরুত্ব আলোচনা করা হলো এ থেকে এটা বুঝে এলো, বান্দা ও মাখলুকের খেদমত করাও একটি বড় ইবাদত। এখন আমরা যদি আমাদের সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে অনায়াসে দেখতে পাব, আমাদের সমাজের এক বৃহৎ অংশ এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত থেকে বঞ্চিত। শুধু সাধারণই না; বরং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তরেও এর ততটা গুরুত্ব নেই।

এখানে বিশেষভাবে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, বান্দার হক বা মাখলুকের খেদমত-সংক্রান্ত বর্ণনায় অনেক জায়গায় মুসলমান শব্দ এসেছে, যেমন বলা হয়েছে এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের সেবা-শুশ্রূষা করা দরকার। অন্য মুসলমানকে সাহায্য করা ওয়াজিব।

তাকে ধোঁকা দেওয়া হারাম। এখানে স্মরণীয় হলো, মুসলমান শব্দ ব্যবহার করার কারণে আমরা যেন এটা না বুঝি, অমুসলিমকে ধোঁকা দেওয়া, তার সাথে মিথ্যা বলা ইত্যাদি জায়েয আছে; বরং এসব হাদীসের অর্থ হলো, এক মুসলমান যেহেতু অন্য মুসলমানের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী হয়ে থাকে—তাই বিশেষভাবে তার কথাই উল্লেখ করে বুঝানো হয়েছে। একজন মানুষ যদি তার সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশীর সাহায্য-খেদমত না করতে পারে, তাহলে অপরিচিত দূরবর্তী প্রতিবেশীর খেদমত বা সেবা কীভাবে করবে? এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তার সার সংক্ষেপ হলো এই :

১. ইসলামী শরীয়তে ইবাদাতের অর্থ অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত। যেটাকে আরকানে আরবাআর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললে অনেক ইসলামী আহকাম ছুটে যেতে বাধ্য।

২. সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিন্দেগীতে ঈমান-একীন আর ইবাদাতের সাথে সাথে খেদমতে খলকেরও সমাবেশ ঘটেছিল, যা অত্যন্ত স্পষ্ট।

৩. তারপরে সাহাবায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীনও এ খেদমত যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪. আমরা যদি স্বীয় দ্বীনদারীর সাথে খেদমতে খলকও জুড়ে নিই, তাহলে ঘোরতর দুশমনের মনেও এর প্রভাব পড়বে। আমরা দাওয়াত-তাবলীগের একটা বিশাল ময়দান পেয়ে যাবো।

৫. খেদমতে খলকের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি ঠিক ওই রকমই অর্জন করা যায়—যেমনটি করা যায় ফরজ ইবাদত দ্বারা; বরং অনেক সময় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র খেদমতও মানুষের নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে।

৬. মানুষের হক আদায়ে শিথিলতা এবং খেদমতে খলকের মধ্যে অলসতার দরুণ নামাজ-রোযা, যিকির-আজকারের নেকীও বরবাদ হয়ে যায়। পরন্ত অনেক সময় এসব আমল করা সত্ত্বেও মানুষ সামান্য হক নষ্ট করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়।

৭. মাখলুকের সেবায় বাহ্যিকভাবে যদিও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়। ওই ব্যক্তি তখন খাদেম থেকে মাখদুমে পরিণত হয়।

৮. আমাদের সেবা-খেদমত যেন সমমনা মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং তাকে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খেদমতের উপকারিতা

খেদমতের সবচেয়ে বড় ফায়েদা স্বয়ং খেদমতকারীই লাভ করে থাকে। তার ভেতর অহংকার সৃষ্টি হয় না। কখনো যদি অহংকার এসেও যায়, তাহলে তা পদে পদে বিদূরিত হতে থাকে।

অধিক ইবাদতের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একটা বুযুর্গীর ভাব জন্মে, কিন্তু খেদমতের মাধ্যমে সে ভাবটা মরে যায়।

তা ছাড়া খেদমত করতে যেয়ে এমন অনেক নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়, যাতে করে মানুষ নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। অন্যের উপর তার জুলুমের হাত প্রসারিত হয় না। আমিত্ব দূর হয়ে বিনয়-নম্রতা জন্ম নেয়। যেমন, আপনি কোনো কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষায় রয়েছেন। তখন আপনার মনে এ অনুভূতি নিশ্চয় পয়দা হবে যে, আমাকেও এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা দরকার, যার দরুণ এ রোগের সৃষ্টি হয়েছে।

তা ছাড়া এর বড় উপকারিতা হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অত্যন্ত সহজে অর্জন করা যায়, যা অন্যান্য ইবাদত দ্বারা ততটা সহজে হয় না।

তৃতীয় উপকার হলো, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্মে। পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম হয়। সমাজ সত্যিকারের সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করে। মুসলমান রাজা-বাদশাদের সম্পর্ক যেহেতু জনসাধারণের সাথে রাজা-প্রজার সম্পর্ক ছিল, তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের বেশি নিকটে আসতে পারেনি, যতটুকু হয়েছে পীর-বুযুর্গ এবং

সুফীদের খেদমতে খলকের কারণে। পক্ষান্তরে ইংরেজরা রাজত্ব করার সাথে মিশনারীদের দ্বারা স্কুল, হাসপাতাল এবং বিভিন্নভাবে জনগণের খেদমত করেছে। তাই আজ বিধর্মীদের বিদ্বেষ ইংরেজদের সাথে ততটা নয়, যতটা আছে মুসলমানদের সাথে।

আপনিও এসব থেকে দু-একটি বেছে নিতে পারেন।

নিচে আমরা কিছু খেদমতের কথা উল্লেখ করছি। প্রত্যেক মুসলমান যদি তার সামর্থ্য অনুযায়ী এর থেকে দু-একটা নিজের জন্য বেছে নেয়, তাহলে আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই অভাবিত সাফল্য অর্জন করতে পারব। অবশ্য এখানে আমরা ওসব খেদমতের কথা আলোচনা করবো না, যা মানুষ স্বীয় সন্তানাদি বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য স্বভাবগত মহব্বতের কারণে করে থাকে; বরং এখানে আমরা এমন কিছু খেদমতের কথা উল্লেখ করতে চাই—যার উপকার সমস্ত মানব জাতিই শুধুমাত্র মানবতার সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কারণে পেতে পারে। চাই তার সাথে আমাদের কোনো সামাজিক পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু খেদমতের প্রাক্কালে আমাদেরকে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

ক. সর্বপ্রথম আমাদের ভেতরে মানবতার সম্মান বোধ জাগ্রত করতে হবে। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। চাই সে সাদা হোক, কালো হোক, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, আরবী হোক বা আজমী হোক। সবাই আল্লাহর মাখলুক। সবাই ভাই ভাই।

সুতরাং তাদের যেকোনো খেদমত কোনো লোভ-লালসা বা বাধ্যবাধকতার কারণে করবো না; বরং আর্তের সেবা আমার ধর্ম, ভ্রাতৃত্বেও দাবি। সে দাবি পূরণ করার জন্যই অন্যের খেদমতে আত্মনিয়োগ। অসহায় অবস্থায় যেমন আমি অন্যের সাহায্য কামনা করি। কাঙ্ক্ষিত সাহায্য না পেলে মনে আঘাত পাই। অনুরূপভাবে সকল মানুষই অন্তরে আঘাত পায়।

খ. এ কাজ আমরা কোনো লোভ-লালসার কারণে করবো না। অন্যে করছে আমারও করা দরকার—এ মনোভাবও থাকবে না। হীনমন্যতায় ভুগবো না; বরং ইসলাম আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। দুনিয়ার জন্য

আমরা হেদায়েতের বাণী নিয়ে এসেছি। এ বাণীর দাবিই এটা হচ্ছে নিজের মধ্যে মায়া-মমতা আর সেবার মনোভাব পয়দা করা। ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা। তা ছাড়া খেদমতের রাস্তা তো আম্বিয়ায়ে কেরামের রাস্তা। এ রাস্তার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যত দ্রুত হেদায়েতের আলো ছড়ানো যায়–অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব হয় না। তাই আমরা এ রাস্তা গ্রহণ করছি।

গ. খেদমতের পথ বড়ই কন্টকাকীর্ণ। পদে পদে নিজের বড়ত্বকে কুরবানী করতে হয়। লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হতে হয়। তাই প্রথমেই নিজেকে আন্তরিকভাবে এর জন্য গড়ে তুলতে হবে। একনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে এ পথে অগ্রসর হতে হবে। কারো প্রশংসা সমর্থন বা সাহায্যের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশাও থাকবে না মনে, তাহলেই অতি অল্প সময়ে এবং ইতিবাচক ফলাফল সামনে আসবে। ঝড়-তুফান, বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমরা যে রিলিফের কাজ করি, তা অধিক প্রশংসনীয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের খেদমত যেন শুধু এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং খেদমত যেন আমাদের মেজাজরূপে গড়ে ওঠে। শুধু একদিনের জন্য নয়; বরং পুরো জীবনের জন্য এটাকে জীবনের একটা অংশ বানিয়ে নিতে হবে।

খেদমতে খলকের কাজ অগণিত-অসংখ্য। কিন্তু তবু এখানে আমরা কিছু কাজের লিস্ট তুলে ধরছি। আপনার সাধ্যানুযায়ী যেকোনো একটি বেছে নিতে পারেন। কিছু খেদমতকে প্রতিদিনের রুটিন বানিয়ে নিতে যেন ভুলবেন না।

কিছু খেদমতের কাজ

১. সর্বপ্রথম নিজের কাজ নিজের হাতে করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ছেলে-মেয়েদেরকেও উৎসাহিত করুন; তারা যেন নিজের কাজ নিজেই করে। তাদের বুঝান, নিজের কাজ নিজে করতে সংকোচ-বোধ করা বা অপমানজনক মনে করা অহংকার ও পতনের কারণ। যেমন, রাতে শোয়ার সময় নিজের বিছানা নিজেই বিছিয়ে নিন।

ঘুম থেকে উঠে নিজেই তা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখুন। নিজের ঘর ঝাড়ু দিন। বাড়ি-ঘর পরিচ্ছন্ন রাখুন। জিনিসপত্র অগোছালো থাকলে নিজের হাতেই সুবিন্যস্ত রাখুন। স্ত্রী বা চাকরের আশায় থাকবেন না।

২. নিজেকে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত করুন। সাদাসিধা জীবনযাপন করুন। আড়ম্বরতা পরিহার করুন। অনাড়ম্বরতা এবং অল্পেতুষ্টির দ্বারা মানুষ প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে।

৩. স্বীয় প্রতিবেশী চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তার খোঁজখবর নিন। প্রয়োজন হলে তার কিছু কাজ করে দিন। তার কোনো প্রয়োজন আপনি যদি মেটাতে অক্ষম হন, তাহলে অন্য কাউকে বলে তা পূরণ করার চেষ্টা করুন।

৪. নিজের সন্তানাদি, আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও মহল্লার অন্যান্য অসহায়, দুর্বল প্রতিবেশীদের খবর নিন। অসুস্থ হলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করুন। প্রয়োজন হলে ডাক্তার দেখানো, ঔষধপত্র কিনে দেওয়া এবং অন্যান্য আর্থিক সহযোগিতা করতে সচেষ্ট হন।

৫. বে-নামাযীদের নামায পড়তে উৎসাহিত করুন। যারা মোটামুটি দ্বীনদার তাদেরকে মাখলুকের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করুন।

৬. নিজ এলাকার অসহায়-এতিম, গরীব আর বিধবাদের তালিকা তৈরি করে তাদের আর্থিক এবং নৈতিক সহযোগিতা করুন। তাদের যদি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, অথচ আপনি নিজে তা পূরণ করতে পারছেন না, তাহলে অন্য লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করুন।

৭. নিজের ছেলে-মেয়ের বিবাহ-শাদীর খরচ থেকে কিছু টাকা বাঁচিয়ে কোনো গরীব আত্মীয় বা গরীব প্রতিবেশীর বা কোনো এতীম ছেলে-মেয়ের বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা করুন।

৮. আপনি নিজের ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার সাথে কোনো গরীব আত্মীয় বা প্রতিবেশীর ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারেও সাহায্য করুন।

৯. কোন অভাবী ব্যক্তি তার অভাবের কথা দায়িত্বশীল পর্যন্ত পৌঁছাতে অক্ষম। আপনি যদি সক্ষম হন, তাহলে তার প্রয়োজন বা অভাবের কথা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট নিঃস্বার্থভাবে পৌঁছে দিন। হাদীসের সুসংবাদের অংশীদার হবেন আপনি।

১০. যত বেশি পারেন অনাড়ম্বরতা আর জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন পরিত্যাগ করুন। অধঃপতন ডেকে আনে, এসব বস্তু থেকে দূরে থাকুন। কোনো বৃদ্ধ বা যুবক যদি বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোনো খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বা অন্য কোনো মাধ্যমে ফেরাতে চেষ্টা করুন।

১১. স্বীয় পিতামাতার অথবা মহল্লার বয়োবৃদ্ধদের প্রতিদিন নিয়মিত কোনো না কোনো খেদমত করার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে যখন তারা একেবারেই অচল হয়ে যায়।

১২. নিজের মহল্লার মসজিদ প্রতিদিন নিজ হাতে পরিষ্কার করুন। বিছানা ইত্যাদি পরিপাটি করে রাখুন। বদনা, পানি ঠিকমতো সাজিয়ে রাখুন। সব কাজ মুয়াজ্জিন বা খাদেমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না।

১৩. নিজের বাড়ি-ঘরের সাথে সাথে মহল্লার গলি বা ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কারের দিকেও যত্নবান হোন। অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। ময়লা-আবর্জনা এদিক-সেদিক না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন।

১৪. কোনো ব্যক্তি যদি রাস্তা বা কারো ঠিকানা খোঁজে, তাহলে শুধু ইশারা না করে কিছু দূর তার সাথে যান। নিজে না জানলে একথা বলবেন না যে জানি না; বরং অন্য কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে বলে দিন।

১৫. রাস্তায় কোনো ইট, পাথর, ময়লা বা কষ্টদায়ক কোনো কিছু পড়ে থাকলে সরিয়ে দিন। অনুরূপ মানুষের জীবনেরও বিভিন্ন বিপদ-আপদ দূর করতে সচেষ্ট হোন।

১৬. কোথাও যদি বন্যা, দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে, তাহলে আর্তপীড়িতদের যথাসম্ভব আর্থিক সহযোগিতার সাথে সাথে শারীরিক খেদমতেও অংশ নিন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিন।

১৭. আপনি ব্যক্তিগত গাড়িতে চড়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় কোনো বৃদ্ধ বা অসহায় ব্যক্তিকে দেখলে গাড়ি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুন সে কোথায় যাবে। আপনার গন্তব্য পথেই যদি তার ঠিকানা হয়, তাহলে তাকে গাড়িতে তুলে পৌঁছে দিন।

'এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা এখনো আমার মনে দাগ কাটে। একবার আমরা মদীনা শরীফ জিয়ারত শেষে ট্যাক্সি করে মক্কার পথে ফিরছিলাম। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি হাত তুললে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে তাকে তুলে নিল। দু-চার মাইল চলার পর সে লোক নামতে চাইলে ড্রাইভার তাকে নামিয়ে দিল। বৃদ্ধ যথারীতি গ্রাম্য তরীকায় ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু ভাড়া দিতে চাইলে ড্রাইভার অত্যন্ত বিনীতভাবে তা নিতে অস্বীকার করলো এবং বললো, শায়েখ আপনি গাড়িতে উঠে আমাকে সম্মানিত করেছেন। পয়সার প্রয়োজন নেই। তার এ ভদ্রতা, মহব্বত আর আন্তরিকতায় আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম।'

১৮. আশেপাশের লোকদের মধ্যে যদি ঝগড়া হতে থাকে, তাহলে আপনি তামাশা না দেখে তাদের মধ্যে মিটমাট করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করুন।

১৯. সরকারের পক্ষ থেকে গরীবদের জন্য যদি কোনো স্কিম বা অনুদানের ঘোষণা হয়, তাহলে গরীবদের এ বিষয়ে অবহিত করুন। এ ব্যাপারে জরুরি সহযোগিতা করুন।

২০. কোনো গরীব অসহায় বা বেওয়ারিশ ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে গেলে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করুন।

২১. কেউ যদি আপনার নিকট পরামর্শ চায়, তাহলে তাকে সঠিক পরামর্শ দিন। ভুল পরামর্শ দেওয়া খেয়ানতের শামিল।

২২. বেশি থেকে বেশি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন : হাসপাতাল, প্রসূতি, এতিমখানা, মাদ্রাসা ইত্যাদি গড়ে তুলুন। গরীব অসহায়দের সাহায্যার্থে বায়তুল মাল গড়ে তুলুন। প্রয়োজনের সময় মানুষদেরকে এর থেকে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করুন।

২৩. আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে কোনো গরীব-কর্মহীনদের কাজ দেওয়ার চেষ্টা করুন। আপনি যদি কোনো শিল্প বা কারিগরি কাজ জানেন, তাহলে কিছু দরিদ্র তরুণকে আপনার এ বিদ্যা শেখান। আপনি যদি কোনো শিক্ষক হন, তাহলে অবসর সময়ে কিছু গরীব শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়ান। আপনি যদি ডাক্তার হন, তাহলে কিছু অসহায় রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা দিন।

২৪. বিভিন্ন মত-পথ ও বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা স্থাপন করার চেষ্টা করুন। তাদের মধ্যে বিভেদ বা দূরত্বের সৃষ্টি করে এমন কথাবার্তা পরিহার করুন।

২৫. কোথাও যদি ছোট ছেলে-মেয়েদের দ্বীন শিক্ষার জন্য ভালো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে নিজ উদ্যোগে সেখানে মকতব প্রতিষ্ঠা করুন। যারা স্কুল কলেজে পড়ে; কিন্তু সহীহভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারে না অথচ আপনি পারেন, তাহলে কিছু সময় বের করে তাদেরকে কুরআন শেখান।

২৬. রাস্তায় বা অন্য কোথাও পানির লাইন বসানো আছে, নল খোলা থাকায় পানি পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তাহলে আপনি নল বন্ধ করে দিন। রাস্তায় সরকারি লাইট অনর্থক জ্বলছে। সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা নিন।

২৭. আপনার এলাকায় যেসব অশিক্ষিত শ্রমিক-মজদুর-কৃষক রয়েছে, প্রতিদিন আপনি তাদেরকে এক ঘণ্টা করে পড়ান, অথবা অন্য কারো দ্বারা এ ব্যবস্থা চালু করুন।

২৮. বাস-ট্রেনে চলার সময় কোনো মুসাফিরের সামানপত্র যদি বেশি হয়, তাহলে তা উঠাতে-নামাতে তাকে সহযোগিতা করুন।

২৯. আপনি স্বীয় সন্তানাদি বা ছাত্রদের থেকে ব্যক্তিগত খেদমত কমিয়ে ইজতিমায়ী খেদমত বেশি উসূল করুন।

৩০. এলাকার মধ্যে দ্বীনদারী কায়েম করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

চারটি কাজ

সারা দুনিয়ায় মুসলমান যদি চারটি জিনিসকে আকড়ে ধরে, তাহলে সমগ্র বিশ্বের বুকে তারা আবার মর্যাদার শীর্ষে আরোহণ করতে পারবে। যে দেশ তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, তা তাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে যাবে।

১. প্রথমে তাদের ঈমান ও একীনকে মজবুত করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো আশা থাকবে না, কাউকে ভয় পাবে না। অন্য কাউকে সমস্যার সমাধানকারী এবং রিজিকদাতা মনে করবে না। যে কোনো ভালো কাজ করবে তার সফলতার জন্য অন্তর থেকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে।

২. ফরজ ইবাদাতের অধিক পাবন্দি করবে। ইবাদতের মধ্যে শুধু নামায, রোযা, হজ্জ না; বরং যাকাতকে ইবাদত মনে করবে। এর একটা টাকার এক একটা পয়সার যাকাত আদায় করবে। কোনো আত্মপ্রচারণা ছাড়াই তা উপযুক্ত প্রার্থীর নিকট পৌঁছে দেবে।

৩. খেদমত, যার বিস্তারিত আলোচনা এ পুস্তিকায় করা হয়েছে। এটিকে স্বীয় জীবনের অঙ্গ বানিয়ে নেবে এবং ইবাদত মনে করে করবে।

৪. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা আর কনসেশনের ধান্ধায় না পড়ে নিজের উপর ভরসা বাড়াতে চেষ্টা করবে। সব সময় এ ফিকির থাকবে যে, আমি যে লাইনেই থাকি না কেন; কারো দয়ার উপর যেন আমাকে বেঁচে থাকতে না হয়। সব সময় নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে হবে।

হায়! যদি আমরাও এমন নমুনা পেশ করতাম

মাদার তেরেসার নাম আমরা অনেকেই জানি। কুষ্ঠ রোগীদের সেবার কারণে তিনি ১৯৭৯ এবং ১৯৮২ সালে দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

তিনি একজন বিদেশী। আজ থেকে ৬০-৭০ বৎসর আগে খ্রিষ্টান মিশনারির একজন কর্মী হিসেবে ভারতে আগমন করেন; এবং কুষ্ঠ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষাকে স্বীয় জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি ভারতের নাগরিকত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করেন। সাধারণভাবে কুষ্ঠ রোগীদের দেখলে ঘৃণা-ভয় এবং অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়। তাই আমরা তার কাছে যেতে চাই না। কিন্তু মাদার তেরেসা তাদের এ রোগে ভীত হননি। মনের মধ্যে ঘৃণা-তাচ্ছিল্যেও স্থান না দিয়ে তাদের জন্য সহানুভূতি আর ভালোবাসা তৈরি করেছেন। মাতৃস্নেহে সবাইকে কোলে তুলে নিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই আজ তিনি একজন শ্রদ্ধাভাজন এবং আলোচিত ব্যক্তি। তার এ একনিষ্ঠ সেবায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের মর্যাদা এবং সেবা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

খ্রিষ্টান মিশনারিরা তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করে। গঠনমূলক কাজ, নিশ্চুপ সেবা এবং মজবুত ফলাফল। তারা এ মূলনীতির দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। মাদার তেরেসা ৬০-৭০ বৎসর ধরে এ মিশন চালিয়েছে। এ সময়ের মধ্যে তিনি না কোনো প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করেছেন, আর না পত্র-পত্রিকায় নিজের বিজ্ঞাপন বা ছবি ছেপেছেন। মানবতার সেবার নামে কোনো সভা-সমিতি, সেমিনার সিম্পোজিয়ামও করেননি। রাজনীতির ডামাডোলেও নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। যার ফল এ হয়েছে যে, এ বৃদ্ধা নারী শুধু ভারতেই নয়; বরং সারা বিশ্বকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। যার পরিণামে বিশ্ব সংস্থা তাকে নোবেল পুরস্কার দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এর পূর্বে অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেও সেবার কারণে কেউ নোবেল পুরস্কার পেয়েছে বলে আমরা জানি না। আফসোস! মুসলমান জাতিও যদি আজ মাদার তেরেসার মতো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারত! আজ কোনো বিপদ-আপদ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউরোপ-আমেরিকার ত্রাণ সংস্থা যত দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে জনসাধারণের খেদমতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বা সংস্থা কিন্তু সেভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। অথচ তাদেরই অবদান বেশি রাখার প্রয়োজন ছিলো। কেননা দ্বীনের তাকাজাও এটাই। কিন্তু আজ আমরা এ ব্যাপারে বড়ই বেখবর।

অথচ তাবলীগের জন্য এটাও একটি জরুরি বিষয়। আজ যদি মুসলমানদের প্রত্যেকটি দল বিশেষ করে উলামায়ে কেরাম এভাবে জাতির চিন্তা-চেতনাকে লালন-পালন করতে পারেন, তাহলে মুসলিম জাতি আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আবার খ্যাতির শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে। আল্লাহ পাকের নিকট দুআ, আল্লাহ পাক মুসলমানদের অন্তরে আবার সে চেতনা পয়দা করে দিন। অন্তরকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আকৃষ্ট করা সবই তার হাতে।

সমাজ সংশোধনের উপায় কী?

মূল
জাস্টিস মাওলানা তাকী উসমানী

অনুবাদ
মীযানুর রহমান কাসেমী

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের খবর নাও। তোমরা যদি সঠিক পথে এসে যাও, তাহলে যারা গোমরাহ, তাদের গোমরাহী তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' (সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১০৫)

কুরআনে পাকের এটি একটি আজিব আয়াত; যা আমাদের একটা বড় রোগের সন্ধান দিচ্ছে। একথা বললে একটুও অতিরঞ্জিত হবে না যে, এ আয়াত আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের সে রোগের দিকে ইশারা করছে। মানুষের মেজাজ আর প্রকৃতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর উত্তম কে বা জানে আর কে বা বলতে পারে মানুষের গোপন রোগের সন্ধান। তা ছাড়া এ আয়াতে আমাদের বড় একটি প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। যে প্রশ্নটি আজ আমাদের অনেকের মনে উঁকি দিতে থাকে।

প্রথমে আমি সে প্রশ্নটাই বলে দিতে চাচ্ছি। এতে আয়াতের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। অনেক সময় আমাদের অন্তরে এ খেয়াল পয়দা হয়, দুনিয়াতে আজ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতি ও সমাজের সংশোধনের জন্য চেষ্টা চলছে। কত আঞ্জুমান, কত জামাত, কত পার্টি, কত মানুষ, কত সভা আর কতই-না মিটিং মিছিল চলছে। সকলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই, কী করে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা দুর্নীতি আর খারাপ জিনিসগুলো বন্ধ করা যায়।

সমাজকে কী করে সঠিক পথে পরিচালিত করা যেতে পারে। আর মানুষ কী করে সত্যিকারের মানুষরূপে গড়ে উঠতে পারে। সবারই দাবি এটা। যেসব দল বা সংগঠন এ চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের সংখ্যা হয়তো হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে সমাজের অবস্থা যদি বাজারে, অফিসে, মাঠে-ঘাটে অত্যন্ত নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে অতি সহজেই বুঝে আসবে যে, ওইসব চেষ্টা-ফিকির একদিকে, আর সমাজের অধঃপতন আরেকদিকে। সংশোধনের কোনো চেষ্টাই সমাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারছে না; বরং মনে হচ্ছে যেন জীবনের গাড়ির চাকা উল্টো দিকেই ঘুরছে। উন্নতি হচ্ছে তো উল্টো দিকেই। ভালোর পথে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সংশোধনের এত সব চেষ্টা কোনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে? দু-একটা পরিবর্তন যে হচ্ছে না এমন নয়, পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু তা খুবই নগন্য। পুরো সমাজের উপর তা কোনো প্রভাব ফেলছে না।

এ প্রশ্নেরই উত্তর আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে দিয়েছেন। সাথে সাথে আমাদের একটা রোগের সন্ধানও দিয়ে দিয়েছেন। সে আয়াতটি সাধারণত আমাদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। তার সঠিক অর্থও আমরা বুঝি না। উদ্দেশ্যও সামনে থাকে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদের খবর নাও। তোমরা যদি সঠিক পথে এসে যাও (হেদায়েত পেয়ে যাও), তাহলে যারা গোমরাহ, তাদের গোমরাহী তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের সকলকেই আল্লাহ পাকের নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে খবর দেবেন।'

আলোচ্য আয়াতে আমাদের একটা মৌলিক রোগ বলে দেওয়া হয়েছে যে, সংশোধনের এ চেষ্টা যা বাহ্যিকভাবে অকৃতকার্য দেখা যাচ্ছে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে, সমাজে যেই সংশোধনের পতাকা নিয়ে দাঁড়ায় সেভাবে সংশোধনের এ কাজ দ্বিতীয় ব্যক্তিই আগে শুরু করুক। এ ব্যক্তি অন্যকে সংশোধনের দাওয়াত দিচ্ছে, অন্যকে পয়গাম দিচ্ছে; কিন্তু নিজের অবস্থা সংশোধন করতে সে নারাজ। নিজের ব্যাপারে সে গাফেল। আজ যদি আমরা স্বীয় কাজের পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, বিভিন্ন মাহফিল বা অনুষ্ঠানে আমরা মজা করে করে সমাজের দোষচর্চা করতে থাকি। ওমুক এ করে, তমুক এ করে ইত্যাদি। অন্যের দোষচর্চা করা,

অন্যের সমালোচনা করা, গীবত করা সমাজে সবচেয়ে সহজ কাজ। এমন কোনো মজলিস বা অনুষ্ঠান খুব কমই পাওয়া যাবে, যেখানে সমাজের অধঃপতন নিয়ে আলোচনা না হয়; কিন্তু এ তাওফীক কখনো হয় না যে, আমার চেহারাটা একবার আয়নায় দেখি এবং ভাবি যে, আমি কতটুকু অধঃপতিত হয়েছি। আমার অবস্থা কতটুকু বিগড়ে গেছে। আমি লোকের সাথে কেমন ব্যবহার করছি। আমার কতটুকু ইসলাহ হওয়া দরকার। না, অন্যের সমালোচনা করতে উস্তাদ, অন্যের দোষ দেখতে পটু। নিজের কোনো খবর নেই। যার ফলে এসব আলোচনা মুখরোচক খবর হিসেবেই সীমাবদ্ধ থেকে স্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

কে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বলে সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে, (অর্থাৎ অন্যের সমালোচনা করে সে বদদ্বীন হয়ে গেছে, অমুক তো বরবাদ হয়ে গেছে, অমুক তো গোমরাহ হয়ে গেছে ইত্যাদি) সে ব্যক্তিই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

কেননা সে তো অন্যের সমালোচনা করছে আর বলছে, অমুক ধ্বংস হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে। তার যদি সত্যিকারেরই বরবাদীর ফিকির থাকত, তাহলে আগে নিজের ফিকির করতো। নিজেকে সংশোধন করতো। যার নিজেরই পেটে ব্যথা, সে অন্যের হাঁচির খবর রাখে কী করে যে, অমুকের তো সর্দি হয়েছে। অমুকের তো হাঁচি আসছে। খোদানাখাস্তা আমার যদি পেটে ব্যথা হয়, তাহলে তো আমি নিজের ফিকির করবো। ব্যথা দূর করার জন্য চেষ্টা করবো। অন্যের কষ্ট বা সামান্য অসুখ নিয়ে তো তখন আমার চিন্তা হবার কথা না; বরং অনেক সময় তো এমনও দেখা যায়, নিজের যদি সামান্য অসুখও হয় আর অন্য লোকের বিরাট বড় কোনো রোগ হয়, তবু ওই বড় রোগের দিকে তার খেয়াল যায় না। সে নিজের ওই সামান্য অসুখ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে।

আমার এক নিকটাত্মীয় নারীর ঘটনা। তার পেটে ব্যথা ছিল এবং সে ব্যথাটা তেমন কোনো মারাত্মক নয়। তবু ডাক্তার দেখানোর জন্য এক হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। লিফটে যাওয়ার সময় দেখলাম হুইল চেয়ারে এক নারী বসা, তার হাত-পা ভেঙে গেছে, তাতে প্লাস্টার লাগানো। বুকের একটা অংশ জ্বলে গেছে। অবস্থা খুবই খারাপ।

আমি নিকটাত্মীয় ওই মহিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দেখুন তো এ নারী কত পেরেশানির মধ্যে আছে। একে দেখে মানুষ নিজের কষ্টের কথাও ভুলে যায়। আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জারি হয়ে যায়। উত্তরে আমার আত্মীয় নারী বললেন, তার হাত-পা ভাঙা ঠিকই কিন্তু আমার মতো তার পেটে ব্যথা তো নেই!

তার খেয়াল পেটে ব্যথাই যেন সবচেয়ে বড় অসুখ। তাই ওই নারীকে এ দুরবস্থার মধ্যে দেখেও নিজের কষ্ট কিছু কম মনে হয়নি। কেননা তার তো নিজের অসুখের চিন্তা আর অনুভূতি রয়েছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির নিজের ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ফিকির থাকে না, সে অন্য লোকের সাধারণ অসুখও দেখে বেড়ায়। মোটকথা, আমাদের বড় একটা অসুখ হলো, আমরা নিজেদের সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন। অন্যের দোষ তালাশ করতে সর্বদা খড়গহস্ত।

এ রোগের ঔষধ কী?

আল্লাহ পাক এ আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! আগে তোমরা নিজের ফিকির করো। আর তোমরা একথা বলছো যে, ওমুক গোমরাহ হয়ে গেছে, তমুক ধ্বংস হয়ে গেছে। স্মরণ রাখো, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথে চলতে শুরু করো, তাহলে তাদের গোমরাহী তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষের সাথে তার নিজের আমলই যাবে। সুতরাং নিজের ফিকির করো। তোমরা সকলেই আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে তোমাদেরকে বলা হবে কী আমল তোমরা করতে। তোমাদের আমল বেশি ভালো ছিল নাকি অন্যের আমল বেশি ভালো ছিলো। হতে পারে আজ তুমি যার

দোষচর্চায় লিপ্ত, যার বিরুদ্ধে তুমি বিষোদ্‌গার করছো, তার কোনো আমল আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে আর সে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে।'

মোটকথা, আজ আমরা যেভাবে কথার ফুলঝুরি দিয়ে মজলিস সাজাচ্ছি, এটা সংশোধনের পন্থা নয়। তবে হ্যাঁ, কোথাও যদি শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই কেউ একত্রিত হয়, আমাদের মধ্যে যেসব দোষত্রুটি পাওয়া যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, যাতে সেসব দূর করার জন্য আমরা সচেষ্ট হতে পারি, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

মানুষের সর্বপ্রথম কাজ হলো, সে নিজের দিবারাত্রির কাজের হিসেব নেবে এবং দেখবে, তার কথা-কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি মোতাবেক এবং তার নির্দেশিত পথে সম্পাদিত হচ্ছে, নাকি তার বিপরীত হচ্ছে। যদি আল্লাহ পাকের মর্জির খেলাফ হয়ে থাকে, তাহলে তা সংশোধন করার কী উপায়? আল্লাহ তাআলা এ ফিকির আমাদের সকলের অন্তরে নসীব করুন।

সমাজ কাকে বলে?

সমাজ তো মানুষের ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করার নাম। সুতরাং সে মানুষই যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সমাজ এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকে যদি অন্যের ফিকির করে, আর নিজেকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়, তাহলে গোটা সমাজই খারাপ হয়ে যাবে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, তাদের প্রত্যেকেই সর্বদা নিজের ফিকিরে ব্যস্ত থাকতেন, আমি কি করে ঠিক হবো। আমার আধ্যাত্মিক রোগ আমি কীভাবে দূর করবো।

হযরত হানযালা রা.-এর ঘটনা। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কোনো মজলিসে থাকতেন, তখন আল্লাহ পাকের স্মরণ সর্বদা মনের মধ্যে থাকত। জান্নাত-জাহান্নাম সব চোখের সামনে ভাসত।

একদিন ভীত-বিহ্বল অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খেদমতে এসে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে।' অর্থাৎ তিনি নিজের ব্যাপারেই বলছেন, 'আমি তো মুনাফিক হয়ে গেছি।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যতক্ষণ আপনার মজলিসে থাকি, আপনার কথাবার্তা শ্রবণ করি, তখন মনে একটা অন্যরকম ভাব থাকে। পরকালের ভয় থাকে। কিন্তু যখন বাইরে যাই এবং দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি, তখন আর সে জজবা থাকে না—যা আপনার খেদমতে থাকা অবস্থায় হয়। এটাই তো মুনাফিকের আলামত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, না; তুমি মুনাফিক হওনি। দিলের এ অবস্থা তো কখনো কখনো এমন হয়ে থাকে। সব সময় দিলের অবস্থা একরকম থাকে না।

হযরত হানযালা রা.-এর মনে এ খেয়াল এসেছে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি অন্য কাউকে মুনাফিক বলেননি; বরং নিজের হিসেবে এমন ব্যস্ত যে নিজের দোষই বড় হয়ে ধরা পড়েছে। হযরত হুযাইফা রা.-কে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক গোপন কথা জানিয়ে রেখেছিলেন। মদীনায় কারা কারা মুনাফিক তাদের নাম পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন। যখন মদীনায় কারো ইন্তেকাল হতো, তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. লক্ষ করতেন, হযরত হুযাইফা রা. তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন কি না। তার অংশ নেওয়াটা আলামত ছিলো ওই ব্যক্তি মুমিন হওয়ার। আর তিনি শামিল না হলে সাহাবায়ে কেরাম বুঝে নিতেন, সে মুনাফিক ছিলো।

হযরত উমর ফারুক রা. যখন খলীফা হলেন আর অর্ধেক দুনিয়া তার করতলগত হলো। যার নাম শুনলে রোম-পারস্য থরথর করে কাঁপত; তিনিও হযরত হুযাইফা রা.-কে অনুনয়-বিনয় করে জিজ্ঞেস করতেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব মুনাফিকদের নাম বলে গেছেন, তার মধ্যে আমার নাম আছে কি না? তার অন্তরে একথার উদয় হতো যে, 'না জানি আমিও মুনাফিক হয়ে গেলাম কি না।'

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাই এরকমই ছিলো। তারা সকলে সতর্ক থাকতেন, আমার কোনো কাজ, কোনো কথা আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুমের বাইরে হচ্ছে কি না। সুতরাং এ ফিকির নিয়ে যখন তারা অন্যকে সংশোধনের কথা বলতেন, তখন সেটা দিলের মধ্যে আছর করত। মানুষের জীবন বদলে যেত। বদলে যেত জাতির জীবনের গতি। আল্লামা ইবনে জাওযী রহ. বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। তার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে যে, তার এক একটা ওয়াজের মজলিসে নয়শত পর্যন্ত মানুষ তাওবা করেছে। ব্যস, একটা মাত্র ওয়াজ। হাজারো লোকের অন্তর বদলে দিয়েছে। এটা এজন্য হয়নি, তার ওয়াজ খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিলো অথবা সাহিত্যে ভরপুর ছিলো; বরং আসল কারণ হলো অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবেগের মাধ্যমে যে কথা বেরিয়ে আসে, তা অতি দ্রুত অন্যের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

আর আমাদের অবস্থা? আমি আপনাকে একটা কথা বলছি অথচ নিজে সেটা আমল করি না। সেজন্য সে কথার কোনো আছরই হয় না। আর যদি প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো আছর হয়ও; কিন্তু শ্রোতা যখন দেখে যে স্বয়ং বক্তাই ওই কাজটা করে না অথচ আমাকে নসীহত করছে। যদি এটা কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে সে নিশ্চয়ই এর উপর আমল করতো। এভাবে ওই কথাটি মাঠে মারা যায়।

নবীজীর নামায

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রমাধূর্য ইনকিলাব সাধিত করেছিলো মাত্র ২৩ বছর। শুধু আরবভূমিতেই নয়; বরং সমগ্র দুনিয়ার চিত্রই বদলে দিয়েছিলো। আর এ পরিবর্তন এজন্যই সম্ভব হয়েছিলো যে, তিনি উম্মতকে যে কাজ করার নির্দেশ দিতেন, নিজেই তার উপর সবচেয়ে বেশি আমল করতেন। যেমন, তিনি আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ করেছেন; কিন্তু নিজে আট ওয়াক্ত পড়তেন। অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছাড়াও ইশরাক, চাশত এবং তাহাজ্জুদও পড়তেন। অবস্থা এমন ছিলো, কখনো কোনো মুসীবত সামনে এলেই সাথে সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহ পাকের কাছে দুআ করতেন।

রোযা

এমনিভাবে অন্যদেরকে পুরো বছরে এক মাস রোযা রাখতে বলেছেন। কিন্তু কোনো মাস এমন যেত না যে মাসে তিনি কমপক্ষে তিনটি রোযা না রাখতেন। এটি তার অভ্যাস ছিলো। কখনো তিনটির বেশিও রাখতেন। আবার কখনো কখনো কয়েকটি রোযা একসাথেও রেখেছেন যাকে 'সওমে বেসাল' বলা হয়। কিন্তু উম্মতের কষ্টের কথা চিন্তা করে তাদের এরকম রোযা রাখা নিষেধ করেছেন।

যাকাত

আপনাকে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার জন্য। এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা ছিলো এই যে, যা কিছু সম্পদ হাতে আসত, সব সদকা করে দিতেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ানোর জন্য জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। একামত শেষ হয়ে গেছে, নামায শুরু হবে। হঠাৎ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামায থেকে সরে এলেন এবং দ্রুত ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে যথারীতি নামায পড়ালেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. হতবাক হয়ে গেলেন ঘটনা কি? নামাযের পর সকলে ঘিরে ধরে আল্লাহর রাসূলকে বললেন, আজ আপনি যে আমল করলেন এমনটা তো আর কোনোদিন করেননি!

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি এজন্য ঘরে গেলাম, জায়নামাযে দাঁড়িয়ে আমার খেয়াল এলো ঘরে সাতটি দিনার রয়ে গেছে। আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাতটি দীনার থাকবে আর আমি আল্লাহ পাকের সামনে দণ্ডায়মান হবো। তাই আমি ঘরে গিয়ে সেগুলোকে সদকা করে এসে নামায পড়লাম।

আল্লাহর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খন্দকও খনন করেছেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় সকলে খন্দক খননে ব্যস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তখন আমীর হওয়ার সুবাদে বসে থাকেননি, যে আমি তো আমীর, আমি কেন কাজ করবো; বরং অন্যান্যদের সাথে তিনিও খন্দক খননে যুক্ত হলেন। সে খনন সোনার কোদাল দিয়ে রূপার ঝুড়িতে এক কোপ মাটি কাটা নয়; বরং অন্যদের ভাগে যতটুকু পড়েছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততটুকু মেপে নিলেন। এক সাহাবী বর্ণনা করেন, খন্দক খননের সময় কষ্টের কোনো পরিসীমা ছিলো না। খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। ক্ষুধার তাড়নায় আমি পেটে একটি পাথর বেঁধে নিয়েছিলাম। পেটে পাথর বাঁধার কথা আমি-আপনি অনেকবার শুনে থাকব, কিন্তু কখনো দেখিনি। আল্লাহ পাক না দেখান। কিন্তু যে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, সে জানে যে পেটে পাথর বাঁধলে কী লাভ।

আসল কথা হলো, ক্ষুধা বেশি লাগলে মানুষ এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, কোনো কাজ করতে পারে না। তখন পেটে পাথর বাঁধলে একটা ওজন সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মধ্যে দাঁড়ানোর শক্তি আসে। নইলে তো সে দাঁড়াতেই পারত না।

যাহোক, সাহাবীদের বর্ণনা হলো, ক্ষুধার তাড়নায় তারা পেটে একটি করে পাথর বেঁধেছিলেন এবং সে অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পাথর বেঁধেছি।' তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পেটের কাপড় তুলে দিলেন। সাহাবী দেখলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেটে দু'টি পাথর বাঁধা। এটাই হলো সে জিনিস, যার শিক্ষা অন্যকে দিয়েছেন নিজে তার উপর বেশি আমল করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ফাতেমা রা. জান্নাতের মহিলাদের সর্দার। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে স্বীয় হস্ত মোবারক দেখিয়ে বললেন, 'যাতা পেষার কারণে হাতে দাগ পড়ে গেছে।

মশক ভরে পানি আনার কারণে সীনায় রশির দাগ বসে গেছে। হে আল্লাহর রাসূল! খায়বার বিজিত হওয়ার পর সমস্ত মুসলমানরা গোলাম-দাসী পেয়েছে যারা তাদের ঘরে কাজ করে। অতএব আমাকেও যদি কোনো দাসী দিতেন, তাহলে ভালো হতো।' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াবে বললেন, 'ফাতেমা! যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমানের ব্যবস্থা না হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবারের জন্য কোনো গোলাম-দাসী আসবে না। এ কষ্টের বদৌলতে আমি তোমাকে গোলাম-দাসী থেকেও উত্তম জিনিসের কথা বলে দিচ্ছি। প্রতি নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ো।' এ কারণেই উক্ত তাসবীহকে ফাতেমী বলা হয়।

অন্যের জন্য তো গোলাম-দাসীর ব্যবস্থা হচ্ছে, অর্থ কড়ি দেওয়া হচ্ছে, আর নিজের ঘরের এ অবস্থা। সুতরাং যখন অবস্থা এই দাঁড়ায় যে বক্তা অন্যের চেয়ে বেশি আমল করে, তখন সেই কথার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়। এবং সে কথা দিলের মধ্যে বসে যায়। মানুষের দুনিয়া বদলে যায়। জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয়।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. আমরা সবাই যার নাম নিতে গর্ববোধ করি। তিনি মানুষের জন্য সহজ সহজ ফাতাওয়া দেওয়ার চেষ্টা করতেন, যাতে করে মানুষকে কষ্টের মধ্যে পড়তে না হয়।

আজকাল বাজারে যে ফল কেনাবেচা হয়, তার নিয়ম হলো যে, বাগানে ফুল আসার পরপরই অথবা ফল ধরার সাথে সাথেই বাগান মালিক অন্যের নিকট ওই বাগান বিক্রয় করে দেয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে এ বিক্রি হারাম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ শরয়ী হুকুমের কারণে অনেক উলামায়ে কেরাম বাজারের এ ফল কেনাবেচা করা বা কিনে খাওয়াকে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু হযরত থানভী রহ. বলেন, এ ফল খাওয়া যেতে পারে। তবে তিনি নিজে কিন্তু কোনোদিন খাননি। সারা জীবন সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

বাজার থেকে কোনো ফল কিনে খাননি অথচ অন্যকে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এরাই হলেন আল্লাহর বান্দা। অন্যকে যা করতে বলেছেন, নিজে তার উপর কঠোরভাবে আমল করেছেন। সেজন্যই তো তাদের কথায় এত প্রভাব ছিল।

আর আমাদের যে শূন্যতা–সেটা হলো, সমাজের সংশোধনের জন্য যে প্রোগ্রাম শুরু হয়, যে সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ব্যক্তি দাঁড়ায় আমি তাদের সংশোধন করবো। অথচ নিজের দোষ-ক্রটির প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই। এজন্যই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিজের খবর নাও। যদি তোমরা রাস্তায় চলে আসো, তাহলে গোমরাহ বা ভুল পথে পরিচালিত ব্যক্তি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং শুধুমাত্র মুখরোচক কথাবার্তা হিসেবে অন্যের কুৎসা গেয়ে কোনো লাভ নেই। নিজের ফিকির করো। যতদূর সম্ভব বেশি থেকে বেশি নিজের সংশোধনে আত্মনিয়োগ করো।

আসলে সমাজের সংশোধনের পথও একটি। কেননা সমাজ কাকে বলে? আমি আপনি আর অন্যান্যদের সমষ্টি মিলিয়েই তো সমাজ। সুতরাং প্রত্যেকেই যদি নিজের ইসলাহ এর ফিকির করি, তাহলে ধীরে ধীরে পুরো সমাজ বদলে যাবে। আর যদি ঘটনা এমন হয়, আমি আপনার সমালোচনা করলাম আর আপনি আমার সমালোচনা করলেন, তাহলে সমাজে কোনো দিনও পরিবর্তন আসবে না। তুমি দেখছ যে, সারা দুনিয়া মিথ্যা কথা বলছে, তুমি বলো না, অন্যে ঘুস খাচ্ছে তুমি খেও না, অন্য লোক সুদ নিচ্ছে তুমি নিও না, অন্যরা ধোঁকা দিচ্ছে, তুমি দিও না, মানুষ হারাম খাচ্ছে, তুমি তা বর্জন করো। কিন্তু একথার তো কোনো অর্থ হয় না যে, মজলিসের মধ্যে তুমি উঁচুকণ্ঠে বললে মানুষের হলোটা কী, সবাই মিথ্যা বলে, অথচ তুমি নিজেই সকাল-সন্ধ্যা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ পাক সকলকে বুঝ দান করুন।

তবে এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, নিজের সংশোধনের ক্ষেত্রে এটাও জরুরি যে, যেখানে হক কথা পৌঁছানো জরুরি সেখানে হক কথা

পৌঁছে দিয়ে নিজের দায়িত্বও পালন করতে হবে। অন্যথায় তাকে কখনো হেদায়াতপ্রাপ্ত বলা যেতে পারে না।

এ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া নিজের সংশোধনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হবে না। একথাই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. একটি হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে তিনি কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতটি সঠিকভাবে না বুঝায় জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন, এবং এ সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যদ্দারা আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝতে সহজ হয়।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. এদিকে ইশারা করেছেন যে, মানুষেরা এ আয়াতের মর্ম এটা বোঝে যে, আল্লাহ্ পাক যখন ইরশাদ করেছেন, নিজের সংশোধন করো, নিজের ফিকির করো, তো ব্যস এখন নিজেরই ফিকির করতে হবে। অন্যের হাজার দোষ করলেও তাদেরকে সতর্ক করা বা তাদের সংশোধনের চেষ্টা আমাদের দায়িত্ব না।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. বলেন, এ আয়াতের মতলব কিন্তু এটা নয়। কেননা, কেউ যদি দেখে যে, একজন আরেকজনের উপর জুলুম করছে অথচ কেউ ওই জালেমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখছে না, তখন আল্লাহর গজব সংশ্লিষ্ট সবার উপরে আসে। হযরত সিদ্দীকে আবু বকর রা. বলেছেন, এ হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, ‘তোমার সামনে কেউ জুলুম করছে আর জালেমকে বাধা দেওয়ার মতো শক্তি তোমার আছে অথচ, তুমি ভাবছ সে জুলুম করছে এটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ, আমি তো কোনো অপরাধ করছি না। সুতরাং তাকে বাধা দেওয়ারও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আর তুমি দলিল দিচ্ছ এ আয়াত দ্বারা। এটা তোমার ভুল। তুমি আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে পারোনি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো এটাও হুকুম করেছেন, জালেমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখার মতো শক্তি যদি তোমার মধ্যে থাকে, তাহলে তাকে বাধা দাও।’

আয়াতের ব্যাখ্যা

আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা হলো, এখানে বলা হয়েছে 'কারো পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না, যদি নাকি তোমরা নিজেদের সংশোধনের ফিকির করো' এর অর্থ হলো, এক ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তার কথা ওই ব্যক্তি শোনে না এমতাবস্থায় তোমার উপর আর কোনো জিম্মাদারী নেই। এখন তার গোনাহে লিপ্ত হওয়া তোমার কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। অতএব এখন তুমি নিজের ফিকির করো, সাধ্যমতো নিজের সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকো। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

যেমন ধরুন, সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে যদি পিতামাতা দেখে তার সন্তান ভুল পথে চলছে, তাহলে তাদের দায়িত্ব হলো তাকে বাধা দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে তাকে বিরত রাখবে। কিন্তু এক ব্যক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও সন্তান তার কথা শুনল না, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার নিকট সে পিতামাতাকে জবাবদিহি করতে হবে না। হযরত নূহ আ.-এর ছেলে শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি। কিন্তু নূহ আ. তাকে বুঝিয়েছেন। তাবলীগ করেছেন। দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ ছেলে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। সুতরাং এমতাবস্থায় এ ব্যাপারে হযরত নূহ আ. জিজ্ঞাসিত হবেন না।

এক ব্যক্তির বন্ধু ভুল কাজে লিপ্ত, ভুল পথে চলছে। আর এ ব্যক্তি তাকে সাধ্যমত মহব্বতের সাথে বুঝিয়ে যাচ্ছে। বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু সে বন্ধু সঠিক পথে ফিরে আসেনি। সুতরাং এখন আর এ ব্যাপারে বন্ধুর কোনো দায়িত্ব নেই।

তুমি নিজেকে ভুলে যেয়ো না

এরপরে আল্লামা নববী রহ. একটি আয়াত নকল করেছেন।

সূরা বাকারার ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদীদের সম্বোধন করে

বলছেন, 'তোমরা অন্যকে সৎ কাজের আদেশ করো আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পড়ো অর্থাৎ তোমরা তাওরাতের আলেম, যার ফলে লোকজন তোমাদের শরণাপন্ন হয়। এ হুকুম যদিও ইহুদীদের জন্য ছিলো কিন্তু মুসলমানদের জন্যও এ হুকুম প্রয়োজ্য হবে যে, যে নাকি অপরকে নসীহত করবে সে যেন নিজেও তার উপর আমল করে।

একথা আমি আগেও বলেছি, এ হুকুম তাবলীগের ব্যাপারে নয়, অর্থাৎ যে স্বয়ং গুনাহে লিপ্ত, সে অন্যকে তাবলীগ করতে পারবে না; বরং তার জন্য হুকুম হলো অপরকে অবশ্যই তাবলীগ করবে, অবশ্যই নসীহত করবে। কিন্তু নসীহত করার পর চিন্তা করবে, অন্যকে যখন বললাম, তখন আমারও তো আমল করা দরকার। নিজেকে সে ভুলবে না। আর এটাও মনে করবে না যে, এ নসীহত অপরের জন্য। বরং মনে করবে এ নসীহত আমার জন্যই। সুতরাং আমাকেই আগে আমল করতে হবে।

বক্তাদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী

এ আয়াতের পরে আল্লামা নববী রহ. একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

ইরশাদ হচ্ছে, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে পড়ার সাথে সাথে ভীষণ গরমের কারণে তার পেটের নাড়িভূড়ি সব বের হয়ে যাবে। আর ওই ব্যক্তি স্বীয় নাড়িভূড়ির চতুর্দিকে এমনভাবে চক্কর লাগাতে থাকবে যেমন, নাকি গাধা কলুর চারদিকে ঘুরতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে জাহান্নামীরা তার চারপাশে জড়ো হবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, ব্যাপার কী? এরকম শাস্তি তোমাকে কেন দেওয়া হচ্ছে? তুমি কি সে ব্যক্তি নও যে, মানুষকে নসীহত করতে, আর মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে? তুমি তো আলেম ফাযেল ছিলে

লোকদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে। তাবলীগ করতে। আজ তোমার এ শাস্তি কেন? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমিই সে-ই ব্যক্তি, তবে আমি মানুষদেরকে নসীহত করতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে তার উপর আমল করতাম না। খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতাম; কিন্তু নিজেই সেটা বেশি করে করতাম। তাই আজ আমার এ শাস্তি হচ্ছে।'

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। এ হাদীস যখন পড়ি, তখন ভয় লাগে। যারা দ্বীনের কাজে যুক্ত, যারা নেকীর কথা বলে, তাদের জন্য এটা বড়ই পরীক্ষার ঘাঁটি। এমন যেন না হয়, আমরাই তার লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হই। আমীন।

চেরাগ থেকে চেরাগ জ্বলে

মোদ্দাকথা, মানুষ যদি নিজের ফিকির না করে, অন্যের সংশোধনের ফিকিরেই লেগে থাকে, অন্যের দোষ তালাশ করতে থাকে, তাহলে এভাবে জাতির পরিবর্তন না হয়ে অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে। যেমনটি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরে এ ফিকির পয়দা করে দিন যে, আমরা যেন অন্যের দোষ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে নিজের ফিকিরে লেগে যেতে পারি। জীবনের যে কদিনই বাকি আছে, পরিশেষে সকলকেই একদিন কবরে যেতে হবে এবং নিজের সব আমলের হিসাব সেখানে দিতে হবে। সুতরাং এ কথাটি স্মরণ রেখে আমরা নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাই। নিজের কাজের হিসাব নিতে থাকি। যে সব দোষ পরিলক্ষিত হয়, তা সংশোধনে আত্মনিয়োগ করি। এভাবে আমি নিজেকে সমাজের জন্য একটি আদর্শ হিসেবে পেশ করি, তাহলে আমার দেখাদেখি আরেকজন এ পন্থা অবলম্বন করবে। তার দেখাদেখি আরেকজন। এভাবেই সমাজে পরিবর্তন আসবে। কেননা চেরাগ থেকে চেরাগ জ্বলে।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

পাঠকের পাতা

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৫০০৯৮২৪, ০১৭৫৩১৮০৫৫৫